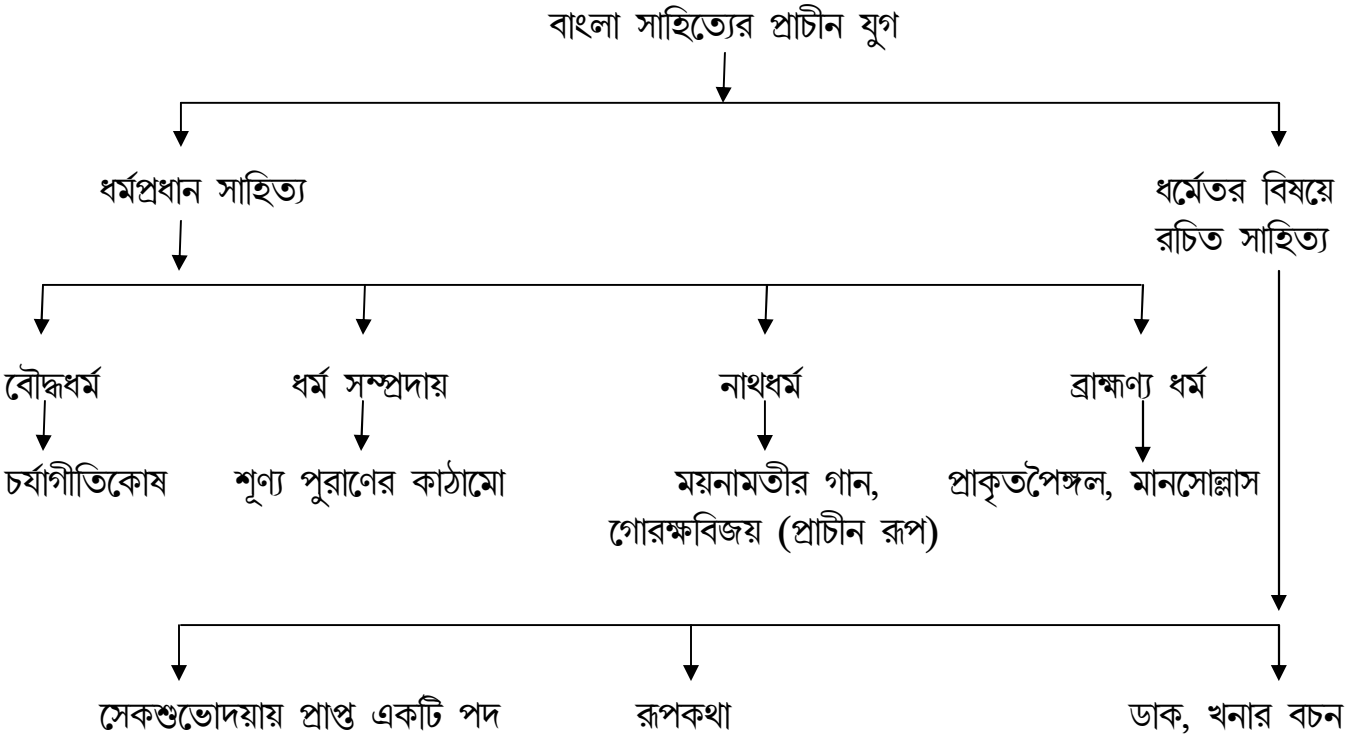
বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ
ধর্মপ্রধান সাহিত্য
ধর্মেতর বিষয়ে রচিত সাহিত্য
বৌদ্ধধর্ম
ধর্ম সম্প্রদায়
নাথধর্ম
ব্রাহ্মণ্য ধর্ম
চর্যাগীতিকোষ
শূণ্য পুরাণের কাঠামো
ময়নামতীর গান, গোরক্ষবিজয় (প্রাচীন রূপ)
প্রাকৃতপৈঙ্গল, মানসোল্লাস
সেকশুভোদয়ায় প্রাপ্ত একটি পদ
রূপকথা
ডাক, খনার বচন

মধ্যযুগের বাংলা 'গীতিকা' সাহিত্য

বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ ও মুসলমান ধর্মের প্রভাব স্থিমিত হলে দেবতাদের প্রকটতাও স্থিমিত হয়ে যায়। এই সময় একদিকে শিক্ষা এবং অন্যদিকে ধর্মের পরিবর্তে মানবিকতার স্বীকৃতি ঘটতে শুরু করে। সমাজের সেই অবসরে লোকমুখে জন্ম নিয়েছিল গল্প যুক্ত গান তথা 'গীতিকা সাহিত্য'।

∇ গীতিকা'র সংরূপঃ

'গীতিকা'র আভিধানিক পরিচয় হ'ল জনপ্রিয় কাহিনি সংবলিত স্তবক যুক্ত যে সংগীত গীত হওয়ার উদ্দেশে রচিত, তাকেই 'গীতিকা' বলা হয়। গবেষক বরুণ কুমার চক্রবর্তী 'গীতিকা'র পরিচয়ে বলেছেন — 'জটিলতামুক্ত মূলতঃ একটি ঘটনাকেন্দ্রিক আখ্যান, সচরাচর যা জনপ্রিয়, নাটকীয়তার মধ্য দিয়ে কোনও প্রকার নীতি-উপদেশে ভারাক্রান্ত না হয়ে, সারল্যকে রক্ষা করে, অপরিণত চরিত্রকে উপলক্ষ করে, ঘটনা ও সংলাপকে আশ্রয় করে গোষ্ঠী বিশেষের মানসিকতা সঞ্জাত হয়ে অজ্ঞাত পরিচয় রচয়িতার আত্মনির্লিপ্তির পরিচয়বাহী, মৌখিক ঐতিহ্যকে প্রাপ্ত ক্ষুদ্রাকৃতির স্তবকে রচিত যে সংগীত তাই হল গীতিকা।' (গীতিকাঃ স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য)

∇ বাংলা গীতিকা সাহিত্যঃ

'লোকসাহিত্যে'র অন্যতম ধারা হল 'গীতিকা' সাহিত্য। বাংলাদেশে তথা বাংলা ভাষায় রচিত 'গীতিকা' সাহিত্যগুলি তিন প্রকারের। যথা — প্রাচীনতম হল 'নাথ গীতিকা' ; এছাড়া আছে 'ময়মনসিংহ গীতিকা' এবং 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'।

∇ নাথ গীতিকাঃ

'নাথ গীতিকার' বিষয়বস্তু হল গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রহণ। 'নাথ ধর্মে'র মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়েছে এইসব গীতিকার মাধ্যমে। 'নাথ গীতিকা'য় দুটি আখ্যান আছে —

ক) গোর্খনাথ-মীননাথের কাহিনি সংবলিত গীতিকা (গোর্খ বিজয়, গোরক্ষ বিজয়, মীনচেতন ইত্যাদি) এবং

খ) গোপী-চন্দ্র ময়নামতীর কাহিনি সংবলিত গীতিকা (মাণিকচন্দ্র রাজার গান, গোপীচঁন্দ্রের সন্ন্যাস)।

মানবিক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় ভাগের 'নাথ গীতিকা'গুলির গুরুত্বই অধিক। 'নাথ গীতিকা'গুলির রচয়িতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন — ভবানী দাস, সুকুর মামুদ, শেখ ফয়জুল্লা, দুর্লভ মল্লিক প্রমুখ।

প্রাচীন 'নাথ গীতিকা'টি হল — দুর্লভ মল্লিক রচিত 'গোবিন্দচন্দ্র গীতি' (পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত)। বিশ্বেশ্বর ভট্টার্চায্ সংগৃহীত ও সম্পাদিত 'ময়নামতীর গান'। আব্দুল সুকুর মহম্মদ রচিত 'গোপীচন্দের সন্ন্যাস'। 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে'র পক্ষে দীনেশচন্দ্র সেন এবং বসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় দুই খণ্ডে — 'গোপীচন্দের গান', 'গোপীচন্দ্রের পাঁচালী' ও 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস'।

∇ ময়মনসিংহ গীতিকাঃ

'ময়মনসিংহ গীতিকা'র আবিষ্কার ও প্রকাশ প্রসঙ্গে তিনটি নাম যুক্ত — 'সৌরভ' পত্রিকার সম্পাদক কেদারনাথ মজুমদার, গীতিকার সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে এবং পৃষ্ঠপোষক ও গ্রন্থ সম্পাদক দীনেশ চন্দ্র সেন। দীনেশচন্দ্র সেন, চন্দ্রকুমার দে-কে 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে'র পক্ষে 'লোকসংগীত সংগ্রাহক' পদে নিযুক্ত করেছিলেন। চন্দ্রকুমার দে, সংগৃহীত পালাগুলি হল — মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কমলা, দেওয়ান ভাবনা, দস্যু কেনারামের পালা, রূপবতী, কঙ্ক ও লীলা, দেওয়ান মদিনা, ধোপার পাট, মইষাল বন্ধু, ভেলুয়া, কমলা রাণীর গান, ঈশা খাঁ মসনদ আলি, ফিরোজ খাঁ দেওয়ান, আয়ান বিবি, শ্যাম রায়ের পালা, শীলা দেবী, আঁধা বন্ধু, বগুলার বারমাসী, রতন ঠাকুরের পালা, পীর বাতাসী, জিরালানি, সোনারায়ের জন্ম এবং ভারাইয়া রাজার কাহিনি।

∇ পূর্ববঙ্গ গীতিকাঃ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৫৪ টি পালায় মোট তিনটি খণ্ডে 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। এই 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'গুলির দুই-তৃতীয়াংশই ময়মনসিংহ জেলা থেকে সংগৃহীত হয়েছিল। ড. আশুতোষ

ভট্টার্চায তাই বলেছেন ‘এই দুই-তৃতীয়াংশ গীতিকাও মৈমনসিংহ গীতিকারই অন্তর্ভুক্ত।’ ‘পূর্ববঙ্গ গীতিকা’র উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পালা হল — কাঞ্চন মালা, শান্তি, নীলা, মাণিকতারা, মদনকুমার ও মধুমালা, নেজাম ডাকাইতের পালা, কফেন চোরা, হাতীখেদা, ভারাইয়া রাজার কাহিনী, চন্দ্রাবতীর রামায়ণ, গোপিনী কীর্তন ইত্যাদি।

গীতিকা সংগ্রহে এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক। তিনি বাংলাদেশের ময়মনসিংহ, ঢাকা, নোয়াখালী, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলা ঘুরে বয়াতী ও গায়েনদের কাছ থেকে পালাগুলি সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর সম্পাদনায় এই পালাগুলি সাতটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল।

উপসংহারে বলা যায় যে, বাংলা সাহিত্যের মূল প্রবণতার বদল ঘটিয়ে মানবিকতার জয়গান করা হয়েছে গীতিকাগুলি। এই গীতিকাগুলি বিষয়ে, পরিবেষণে, সংরূপে বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্য

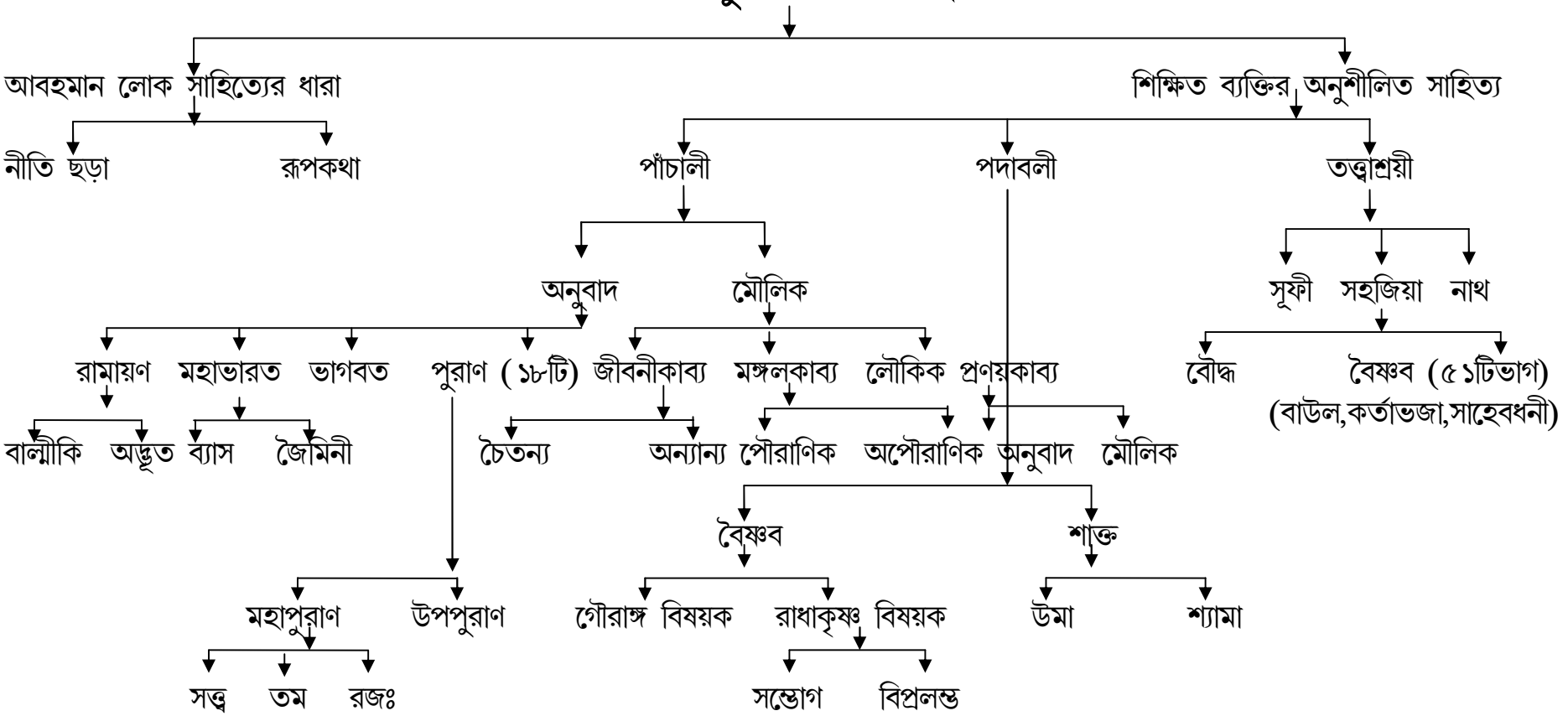

- ❖ সত্ত্ব মহাপুরাণ - বিষ্ণু, নারদ, ভাগবত, পদ্ম, গরুড়, বরাহ,
- ❖ তম মহাপুরাণ - কূর্ম, মৎস, লিঙ্গ, শিব, অগ্নি, স্কন্দ,
- ❖ রজঃ মহাপুরাণ - ব্রহ্মা, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত, বামন, ব্রহ্মাণ্ড
- ❖ উপপুরাণ - সনৎকুমার, নর-সিংহ, নারদীয়, শিব, দুর্বাসা, কপিল, মানব, ঔষনস, বরুণ, কালিকা, শাম্ব, নন্দী, সৌর, পরাশর, আদিত্য, মহেশ্বর, ভাগবত ও বশিষ্ঠ ।
  - o পৌরাণিক মঙ্গলকাব্য - অন্নদা, কালিকা, সূর্য, ভবানী, লক্ষ্মী, শিব, নারায়ণী ইত্যাদি
  - o অপৌরাণিক মঙ্গলকাব্য - মনসা, চন্ডী, ধর্ম, রায়, ষষ্ঠী, শীতলা, সত্যনারায়ণ, বনবিবি ইত্যাদি ।

টপ্পা গান

টপ্পা গান গান কী?

টপ্পা গান পাঞ্জাব ও বাংলা অঞ্চলের একটি লৌকিক গান। এটি পাঞ্জাব অঞ্চলের মূল গানের সাথে মিল থাকলেও বাংলায় এটি রাগাশ্রয়ী গান হিসেবে পরিচিত। অনেকে বিশ্বাস করেন রামনিধি গুপ্ত টপ্পা গানের উদ্ভাবক। রামনিধি গুপ্ত সকলের কাছে নিধু বাবু নামে পরিচিত। পণ্ডিতগণের একটি বড়ো অংশ আবার মনে করেন— বাংলা টপ্পা গান চালু করে কালী মীর্জা তবে নিধু বাবুর কারণে এটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে।

বাংলা অঞ্চলের আধুনিক বাংলাদেশের চেয়ে আধুনিক ভারতের পশ্চিমবঙ্গে টপ্পা গানের জনপ্রিয়তা অনেক বেশি।

টপ্পা গানের আদিভূমি পাঞ্জাব।

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে পাঞ্জাব অঞ্চলের লোকগীতি টপ্পা গানের প্রচলন শুরু হয়। প্রধানত উটের গাড়ি চালকের মুখেই টপ্পা গান বেশি শোনা যেত। শোরী মিয়া (১৭৪২-১৭৯২) নামে একজন সংগীতজ্ঞ টপ্পা গানগুলোকে সাঙ্গীতিক আদর্শে সাজিয়ে সম্পূর্ণ আলাদা একটি গায়ন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। এ পদ্ধতি অনুসরণ করে রামনিধি গুপ্ত বা নিধু বাবু (১৭৪১-১৮৩৯) বাংলা টপ্পা রচনা করেন। এখানেই ভারতীয় বা হিন্দুস্থানী রাগসংগীতের ধারার সঙ্গে বাংলা রাগসংগীত চর্চা যুক্ত হয়। পরবর্তীতে টপ্পাকার কালীমির্জা (১৭৫০-১৮২০), বাংলা ভাষায় ধ্রুপদ রীতির প্রবর্তক রামশংকর ভট্টাচার্য (১৭৬১-১৮৫৩) এবং বাংলা ভাষায় খেয়াল রচয়িতা রঘুনাথ রায় (১৭৫০-১৮৩৬) বাংলা গানকে আরও সমৃদ্ধ করে হিন্দুস্থানী রাগসংগীতের ধারার সঙ্গে যুক্ত করেন।

টপ্পা গান কীভাবে চালু হয়

টপ্পা গানের উৎপত্তি কখন এবং কীভাবে শুরু হয়েছিল, তা নিয়ে নানা রকমের গল্প আছে। A.F. Strangways তার *Music of India* গ্রন্থে বলেন যে, পাঞ্জাবের উট চালকদের লোকগান থেকে টপ্পার উৎপত্তি। কিন্তু অনেকেই এই কথা মানতে রাজি নন। তবে আদি টপ্পাতে পাঞ্জাবি ভাষার আধিক্য রয়েছে। এই বিচারে বলা যায়, পাঞ্জাবের লোকগীতি থেকে টপ্পা গানের সূত্রপাত ঘটেছিল। হয়তো অন্যান্য পেশার মানুষের সাথে উটচালকরা এই গান গাইতেন। কাপ্তেন উইলার্ডকে উদ্ধৃতিকে অনুসরণ করে রাজ্যেশ্বর মিত্র তাঁর *বাংলার গীতিকার ও বাংলা গানের নানা দিক* গ্রন্থের টপ্পা গানের উৎস সম্পর্কে লিখেছেন: *"টপ্পা ছিল রাজপুতনার উষ্ট্র চালকদের গীত। শোনা যায়, মধ্যপ্রাচ্য থেকে যেসব বণিক উটের পিঠে চেপে বাণিজ্য করতে আসত, তারা সারারাত নিম্নস্বরে টপ্পার মতো একপ্রকার গান গাইতে গাইতে আসত। তাদের গানের দানাদার তানকেই বলা হতো 'জমজমা'। আসলে জমজমা শব্দে 'দলবদ্ধ উষ্ট্র' বোঝায়। সাধারণভাব উষ্ট্রবিহারিদের গানও এই শব্দের আওতায় এসে গেছে। লাহোরে উট বদল হতো। এই লাহোর থেকেই টপ্পার চলটি ভারতীয় সংগীতে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে।"*

বাংলা টপ্পা গান

বাংলা টপ্পা গানের আদি পুরুষ কালী মীর্জা। ১৭৮০-৮১ খ্রিষ্টাব্দের দিকে তিনি সংগীত শিক্ষা শেষে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। কালী মীর্জা হুগলিতে এসে বসবাস শুরু করেন। এখানেই তিনি বাংলা টপ্পা গানের চর্চা শুরু করেন। তিনি একাধারে গীতিকার, সুরকার এবং গায়ক ছিলেন।

বলা হয়ে থাকে যে, নিধু বাবুর অনেক আগে থেকে বাংলা টপ্পার প্রচলন করেন কালী মীর্জা। উল্লেখ্য, ছাপরা থেকে কলকাতায় ফিরে নিধুবাবু বাংলা টপ্পা শুরু করেন ১৭৯৪ খ্রিষ্টাব্দে। সময়ের নিরিখে বাংলা টপ্পার আদি পুরুষ বলতে কালী মির্জাকে বিবেচনা করা হয়।

বাংলা টপ্পা জলপ্রিয়তা লাভ করেছিল রামনিধি গুপ্ত তথা নিধুবাবু'র সূত্রে। ১৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সরকারী রাজস্ব আদায় বিভাগে চাকরি লাভ করেন। এই বছরেই তিনি বিহারের ছাপরা জেলার কালেক্টর অফিসে দ্বিতীয় কেরানি হিসেবে কাজ শুরু করেন। ছাপরাতে তিনি প্রথম তিনি এক ওস্তাদের কাছে রাগ সংগীতের তালিম নেওয়া শুরু করেন।

পরে ছাপরা জেলার রতনপুরা গ্রামের ভিখন রামস্বামীর মন্ত্র শিষ্য হন। এই সময় তিনি উত্তরভারতের বিভিন্ন ধরনের গানের সাথে পরিচিত হয়ে উঠেন এবং বিভিন্ন সংগীতশিল্পীদের কাছে রাগ সংগীত শেখেন। এই সময় লক্ষ্ণৌ অঞ্চলে শোরী মিঞা'র টপ্পা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। বিভিন্ন শিল্পীদের মাধ্যমে তিনি সম্ভবত ওই টপ্পার সাথেও তার পরিচয় ঘটেছিল।

১৭৯৪ খ্রিষ্টাব্দে শোরী মিঞা ছাপরা থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন। কলকাতায় ফিরে তিনি শোভাবাজারে একটি আটচালা ঘরে সংগীতের বসানো শুরু করেন। এই ঘরে প্রতিরাত্রে নিধুবাবু'র গানের আসর বসতো। এই আসরেই তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে টপ্পার সূচনা করেন তিনি। পরে এই আসরের আয়োজন হতো বাগবাজারের রসিকচাঁদ গোস্বামীর বাড়িতে। এই সকল আসরের ভিতর দিয়ে রামনিধি গুপ্ত-এর গান হয়ে যায় নিধুবাবু'র গান বা নিধুবাবু'র টপ্পা।
কালী মীর্জা এবং নিধুবাবুর পরে বাংলা টপ্পাকে সচল রাখেন শ্রীধর কথক। শ্রীধর সযত্নে কালী মীর্জা এবং নিধুবাবুর টপ্পাকে ধারণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তবে তার গানে নিধুবাবুর প্রভাবই বেশি। এরপর পশ্চিমা টপ্পা শিখে বাংলা টপ্পার জগতে আসেন মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। সংগীতে তার অসাধারণ দখলের কারণে তিনি মহেশ ওস্তাদ নামে খ্যাত হয়েছিলেন। মহেশচন্দ্র ১৮৫০-১৯০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তার বাংলা টপ্পাকে সজীব করে রেখেছিলেন। এরপরে শ্রী রামকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯২১-২০০৯) ছিলেন টপ্পা সংগীতের শেষ জনপ্রিয় গায়ক।

টপ্পা গানের নামকরণ হয় কীভাবে?

উত্তর ভারতীয় সংগীতে অর্ধ-শাস্ত্রীয় সংগীত হিসেবে টপ্পা একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। সংস্কৃত লম্ফ শব্দ রূঢ়ারার্থে হিন্দুস্থানি সংগীত গৃহীত হয়েছিল। এর অর্থ সংক্ষেপ্ত। খেয়াল বা ধ্রুপদের সংক্ষিপ্তরূপ হিসেবে হিন্দিতে 'টপা' শব্দ গৃহীত হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে এই শব্দটি দাঁড়ায় টপ্পা।

টপ্পা গানের বিশেষত্ব

টপ্পার স্বাভাবিক করুণ রস, প্রেম, প্রধানত বিরহকে বিষয়বস্ত্ত করে রচিত বলে টপ্পার উপযোগী কিছু বিশেষ রাগও আছে, যেমন: রাগ ভৈরবী, খাম্বাজ, দেশ, সিন্ধু, কালাংড়া, ঝিঁঝিট, পিলু, বারোয়া প্রভৃতি।
নিধুবাবুর রচিত টপ্পা গানে বিরহের প্রকাশ কত মার্জিত, পরিশীলিত; একটি গানের উদাহরণ দিলে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে: "বিধি দিলে যদি বিরহ যাতনা / প্রেম গেল কেন প্রাণ গেল না / হইয়ে বহিয়ে গেছে প্রেম ফুরায়েছে / রহিল কেবলি প্রেমেরি নিশানা।"

কিছু জনপ্রিয় টপ্পা গানের নাম

- মারিলে মারিতে পারো, রাখিতে কে করে মানা?
- নানান দেশে নানান ভাষা
- পিরীতি না জানে সখী
- আসিবে হে প্রাণ কেমনে এখানে
- সখি! কোথায় পাব তারে, যারে প্রাণ সঁপিলেম
- যাও! তারে কহিও, সখি, আমারে কি ভুলিলে
- আমি আর পারি না সাধিতে এমন করিয়ে
- ভ্রমরারে! কি মনে করি আইলে প্রাণ নলিনী ভবনে
- শুন, শুন, শুনলো প্রাণ! কেন তুমি হও কাতর
- ঋতুরাজ! নাহি লাজ, একি রাজনীত
- কি চিত্র বিচিত্র কুসুম ঋতুর চরিত্র গুণ
- মধুর বসন্ত ঋতু! হে কান্ত! যাবে কেমনে
- এ কি তোমার মানের সময় ? সমুখে বসন্ত
- শৈলেন্দ্রতনয়া শিবে, সদাশিবে প্রদাভবে
- অপার মহিমা তব, উপমা কেমনে দিব
- শঙ্করি শৈলেন্দ্র সুতে, শশাঙ্ক শিখরাশ্চিতে

প্রণয় উপাখ্যানের ধারাঃ সৈয়দ আলাওল

বাংলা সাহিত্যে মধ্য যুগ পর্বের সাহিত্য মূলত দেববাদে বিশ্বাস ও দেবস্তুতিতে লেখা — এই ধারায় মানবতাবাদ নিয়ে লেখা হয়েছে 'প্রণয় উপাখ্যান' ও 'গীতিকা সাহিত্য'। 'প্রণয় উপাখ্যানে'র ধারায় সবথেকে জনপ্রিয় কবি হলেন সৈয়দ আলাওল।

ব্যক্তি পরিচয়ঃ কবি সৈয়দ আলাওলের জন্ম ষোড়শ শতকের শেষভাগে এবং ১৬৭৩ সালে মৃত্যু হয়। কবির পিতা ছিলেন নবাব কুতুবের সভাসদ। একদা নৌকা যাত্রার সময় জলদস্যুদের হাতে তাঁর পিতা খুন হন এবং কবি পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন। ভাগ্য বিড়ম্বিত হয়ে তিনি রোসাঙ রাজার অশ্বারোহী বাহিনিতে সামান্য কাজ পান। আলাওলের কবি প্রতিভার গুনে তাঁর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়। রোসাঙের প্রধান অমাত্য মাগন ঠাকুর, অর্থমন্ত্রী সুলেমান, পণ্ডিত সৈয়দ মুসা ও আরাকানের রাজা শ্রীচন্দ্র সুধর্মার আনুকূল্যে কবি আলাওল বেশ কয়েকটি কাব্য লিখেছিলেন।

কাব্য পরিচয়ঃ কবির সবথেকে জনপ্রিয় কাব্য 'পদ্মাবতী' (১৬৪০-৪৬)। তৎপরে লিখেছেন 'সয়ফুলমূলক বদি-উজ্জমাল' (১৬৫৮-৬০), 'সপ্ত পয়কর' (১৬৬০), 'তোহফা' (১৬৬৩-৬৯), 'সেকেন্দার নামা' (১৬৭২)। নিম্নে কাব্যের পরিচয় দিয়ে কবির প্রতিভা মূল্যায়ণ করা হল।

পদ্মাবতীঃ 'পদ্মাবতী' কাব্যটি হিন্দি কবি মালিক মুহম্মদ জায়সি-র 'পদুমাবৎ'-এর অনুবাদ। চিতোরের রাণা রত্নসেনের দ্বিতীয় পত্নী পদ্মিনী ছিলেন অপরূপ সুন্দরী। দিল্লির সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি, রাণী পদ্মিনীর রূপের সুখ্যাতিতে মুগ্ধ হয়ে তাকে পাওয়ার জন্য চিতোর আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে চিতোরের রাণা রত্নসেন শহীদ হন এবং রাণি পদ্মিনী সতীত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যে জহরব্রতে আত্মহত্যা করেন।

আলোচ্য 'পদ্মাবতী' সূফী সাধন তত্ত্বের রূপক কাব্য। কাব্যে চিতোর অর্থে মানবদেহ, রত্নসেন অর্থে জীবাত্মা, পদ্মিনী অর্থে বিবেক ও শুক পাখি ধর্ম গুরুর প্রতীক।

দ্বিতীয়ত কাব্যে প্রেম ও বিরহ লৌকিক হলেও প্রকৃতপক্ষে অধ্যাত্ম রসব্যঞ্জক।

তৃতীয়ত — কাব্যটি উদার ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশিষ্ট।

চতুর্থত — দক্ষতার সঙ্গে কবি রাজসভার ঐশ্বর্যের পরিচয় (যুদ্ধ, ঘোড়দৌড়, শিকার ইত্যাদি) দিয়েছেন।

পঞ্চমত — সংস্কৃত ও লৌকিক উভয় কাব্যভাষাই ব্যবহৃত হয়েছে।

ষষ্ঠত — ছন্দ, অলংকারে কবি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। যেমন — 'পদ্মাবতী সাক্ষাট রমণীকুল শোভা / মিহির প্রভাবে যেন নিশাকর প্রভা' (বাচ্য-উৎপ্রেক্ষা অলংকার)।

সপ্তমত — কবির প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার বিচিত্র জীবন অভিজ্ঞতার পরিচায়ক। যেমন — ক) 'পড়শী হইলে শত্রু গৃহে সুখ নাই / নৃপতি হইলে ক্রোধ দেশে নাই ঠাঁই'। খ) 'তীক্ষ্ণ খড়্গ দেখিয়া জলের কিবা ভয় / ছেদিলে শতেক বার দুই খণ্ড নয়'।

সয়ফুলমূলক বদি-উজ্জমালঃ কাব্যটি কাজী সৈয়দ মসুদ শাহের উৎসাহে লেখা। কাব্যের বিষয় ইসলামীয় রোম্যান্টিক কাহিনি। কাব্যের নায়ক সয়ফুলমূলক এবং নায়িকা পরী বদি-উজ্জমাল। আখ্যানে এই দুই নায়ক-নায়িকার প্রেম দেখানো হয়েছে।

সপ্ত (হপ্ত) পয়করঃ আরাকানের সেনাপতি সৈয়দ মহম্মদের নির্দেশে আলাওল কাব্যটি লিখেছিলেন। আঞ্চলিক ভাষার প্রভাবে 'সপ্ত' > 'হপ্ত' উচ্চারিত হয়েছে। কাব্যটির মূল অবলম্বন নেজামি সমরকন্দের ফারসি ভাষায় লেখা। আখ্যানে রাজকুমার বাহরামের যুদ্ধ জয় ও তার সাত পত্নীর গল্প বর্ণিত হয়েছে। কাব্যের গল্প অংশ আকর্ষণীয় হলেও কাব্যমূল্য দুর্বল।

তোহফাঃ মাগন ঠাকুরের নির্দেশে কবি 'তোহফা' কাব্যটি লিখেছিলেন। কাব্যটি পয়তাল্লিশটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত এবং ইসলামী উপদেশের নীতি গ্রন্থ।

সেকেন্দারনামাঃ প্রধান অমাত্য নবরাজ মজলিসের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং নির্দেশে কবি আলাওল 'সেকেন্দারনামা' লিখেছিলেন। মূলকাব্য 'ইসকন্দরনামা' ফারসি ভাষায় লেখা নেজামি সমরকন্দের লেখা। কাব্যটির উপজীব্য আলেকজান্ডারের বিজয় কাহিনি।

সতী ময়না বা লোরচন্দ্রানীঃ কবি দৌলত কাজী-র লেখা 'সতী ময়না বা লোরচন্দ্রানী' কাব্যের অসম্পূর্ণ অংশ কবি আলাওল সমাপ্ত করেন। এই অংশে কবি আলাওলের প্রতিভা দৌলত কাজী-র তুলনায় কম নয়।

মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্য যখন দেবতাদের মহিমা কীর্তন করছিল, সেই পর্বে মানুষের কীর্তন তথা মানবতার কথা নিয়ে রোসাঙের রাজসভায় নতুন কাব্যধারার চর্চা শুরু হয়েছিল। এই কাব্য চর্চায় দৌলত কাজী প্রথম হলেও প্রধান কবি সৈয়দ আলাওল। কবি আলাওল ইসলামী কাহিনি ও ধর্মতত্ত্বের নানা গ্রন্থ মূল আরবি ও ফারসি থেকে অনুবাদ করেছিলেন — তবে সেগুলির ধর্মনিরপেক্ষতা বৌদ্ধ-হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের কাছেই সমাদৃত হয়েছে।

বাংলা প্রণয়োপাখ্যানের ধারা

'কর্ণফুলী নদী পূর্ব্বে আছে এক পুরী।
রোসাঙ্গ নগরী নাম স্বর্গ-অবতরী॥
তাহাতে মগধ বংশ ক্রমে বুদ্ধাচার।
নাম শ্রীসুধর্ম্ম রাজা ধর্ম্ম-অবতার॥ ...' ('সতী ময়না'/ দৌলত কাজী)

বৌদ্ধ রাজা থিরী-থু-ধম্মা (শ্রীসুধর্মা)-র সমর সচিব আশরফ খাঁ-র আদেশে কবি দৌলত কাজী 'সতী ময়না' কাব্য লিখেছেন। প্রসঙ্গত রাজা শ্রীসুধর্মা-র রাজ্য বর্তমান মায়ানমার থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আবার ইবন বতুতা-র ভ্রমণবৃত্তান্ত অনুসারে খ্রিস্টিয় নবম-দশম শতক থেকে আরবদের সঙ্গে রোসাঙ্গের যোগাযোগ ছিল। কবি সৈয়দ আলাওলের কথায় —

নানা দেশী নানা লোক, শুনিআ রোসাঙ্গ ভোগ
আইসন্তি নৃপ ছায়াতল। (পদ্মাবতী)

এদের মধ্যে ছিল আরবী, মিছিরী, সামী, তুরুকী, হাবসী, রুমী, খোরাছানী, উজবেগ, লাহুরী, মুলতানী, সিন্ধি, কর্ণালী, মলয়াবারী, কামরূপী, বঙ্গদেশী ইত্যাদি। আপাত পরিচয়ে বাংলা ভাষা-র মূল ভূখণ্ডের বাইরের দেশ হলেও রোসাঙ্গের সঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চা হত এবং রাজসভা কেন্দ্রিক সাহিত্য চর্চার ঐতিহ্য থেকেই বাংলা সাহিত্য চর্চার সূত্রপাত ঘটেছিল। এই রাজসভায় বিশেষভাবে দুইজন কবি-র বাংলা সাহিত্যে নিজেদের কৃতিত্বে প্রতিষ্ঠিত করেছেন — দৌলত কাজী ও সৈয়দ আলাওল।

কবি দৌলত কাজীঃ কবি দৌলত কাজী চট্টগ্রামের রাউজান থানার সুলতানপুরে জন্মেছিলেন। তিনি অল্প বয়সে নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয়ে ওঠেন। তাঁর প্রতিভাকে প্রবীণ পণ্ডিতেরা সম্মান না করায় তিনি প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতির আশায় আরাকানে চলে আসেন। একদা বহু পণ্ডিত সম্মানিত আরাকানের রাজসভায় পণ্ডিতদের মধ্যে একটি বিতর্ক বাঁধে — যার সমাধান দৌলত কাজী করে দিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

কাব্য পরিচয়ঃ কবি দৌলত কাজী 'সতী ময়না' কাব্য অসম্পূর্ণ রেখে প্রয়াত হয়েছিলেন। 'সতী ময়না' কাব্যটির তিনটি খণ্ড। কাব্যের প্রথম খণ্ডে রাজা লোর ও পত্নী ময়না-র দাম্পত্য জীবন, অতৃপ্তি ও নিষ্ফলতার আখ্যান বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে রাজা লোরের মৃগয়া ভ্রমণ ও দীর্ঘ দিন না আসায় প্রধান নায়িকা ময়নামতী-র বিরহ এবং তার প্রতি ছাতন কুমারের প্রেম নিবেদন, লিপ্সা দেখানো হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে স্বামী লোর ও সতীন চন্দ্রানীর সাক্ষাৎ ঘটে। তবে কবি দৌলত কাজী দ্বিতীয় খণ্ডের বা 'বারমাসী' একাদশ মাস পর্যন্ত বিরহের গাথা লিখে প্রয়াত হয়েছিলেন। কাব্যের শেষ অংশ কবি সৈয়দ আলাওল লিখেছেন।

কবি দৌলত কাজী-র কবিত্বের মূল্যায়ণঃ কবি দৌলত কাজী অসম্পূর্ণ কাব্য না লিখে কেবল 'বারমাসী' লিখলেও 'বাঙ্গালী তাঁহাকে প্রাচীন কবিদের মধ্যে উচ্চে স্থান না দিয়া পারিতেন না' (আরকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য / আবদুল করিম ও মুহম্মদ এনামুল্ হক্)। তাঁর 'বারমাসী' অন্যান্য কবিদের মতো নায়িকার খেদোক্তি নয় — মালিনীর মুখ দিয়ে ময়নার প্রত্যুত্তরছলে লেখা। এতে যে লিপি চার্তুয, প্রকাশ ভঙ্গি — তা আধুনিক গীতিনাট্য বা Melodrama-য় দেখা যায়।

দ্বিতীয়ত — এই 'বারমাসী'-তে নায়িকার মানসিক চাঞ্চল্য ও দুর্বলতার পরিবর্তে নায়িকার অদ্ভুত আত্মিক শক্তি ও প্রলোভন-বিজয়ী অটল হৃদয়ের চিত্র কবি অঙ্কন করেছেন।

তৃতীয়ত — এই কাব্যে ব্রজবুলি ভাষার ব্যবহার চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করেছে।

চতুর্থত — এই কাব্যে উপদেশ দিতে গিয়ে কবি প্রবাদ-প্রবচনের জন্ম দিয়েছেন।

পঞ্চমত — শাহ মুহম্মদ সগীরের 'ইউসুফ জোলেখা' আবিষ্কারের (১৯৭৮) পূর্বে আদি বাংলা প্রণয়োপাখ্যানের কবির সম্মান পেয়েছেন দৌলত কাজী।

ষষ্ঠত — বাংলা ভৌগলিক সীমানার বাইরে বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চার গৌরবে দৌলত কাজী আদি কবি — এই ঐতিহাসিক মূল্যও তাঁর সম্মান।

<u>নমুনা প্রশ্নঃ</u> বাংলাদেশের বাইরে বাংলা সাহিত্য চর্চার কারণ বিশ্লেষণ কর। আরাকান রাজসভার প্রথম বাঙালি কবির নাম উল্লেখ করে তাঁর সাহিত্য কৃতির পরিচয় দাও।

প্রণয় উপাখ্যানের ধারাঃ সৈয়দ আলাওল

বাংলা সাহিত্যে মধ্য যুগ পর্বের সাহিত্য মূলত দেববাদে বিশ্বাস ও দেবস্তুতিতে লেখা — এই ধারায় মানবতাবাদ নিয়ে লেখা হয়েছে 'প্রণয় উপাখ্যান' ও 'গীতিকা সাহিত্য'। 'প্রণয় উপাখ্যানে'র ধারায় সবথেকে জনপ্রিয় কবি হলেন সৈয়দ আলাওল।

ব্যক্তি পরিচয়ঃ কবি সৈয়দ আলাওলের জন্ম ষোড়শ শতকের শেষভাগে এবং ১৬৭৩ সালে মৃত্যু হয়। কবির পিতা ছিলেন নবাব কুতুবের সভাসদ। একদা নৌকা যাত্রার সময় জলদস্যুদের হাতে তাঁর পিতা খুন হন এবং কবি পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন। ভাগ্য বিড়ম্বিত হয়ে তিনি রোসাঙ রাজার অশ্বারোহী বাহিনিতে সামান্য কাজ পান। আলাওলের কবি প্রতিভার গুনে তাঁর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়। রোসাঙের প্রধান অমাত্য মাগন ঠাকুর, অর্থমন্ত্রী সুলেমান, পন্ডিত সৈয়দ মুসা ও আরাকানের রাজা শ্রীচন্দ্র সুধর্মার আনুকূল্যে কবি আলাওল বেশ কয়েকটি কাব্য লিখেছিলেন।

কাব্য পরিচয়ঃ কবির সবথেকে জনপ্রিয় কাব্য 'পদ্মাবতী' (১৬৪০-৪৬)। তৎপরে লিখেছেন 'সয়ফুলমূলক বদি-উজ্জমাল' (১৬৫৮-৬০), 'সপ্ত পয়কর' (১৬৬০), 'তোহফা' (১৬৬৩-৬৯), 'সেকেন্দার নামা' (১৬৭২)। নিম্নে কাব্যের পরিচয় দিয়ে কবির প্রতিভা মূল্যায়ণ করা হল।

পদ্মাবতীঃ 'পদ্মাবতী' কাব্যটি হিন্দি কবি মালিক মুহম্মদ জায়সি-র 'পদুমাবৎ'-এর অনুবাদ। চিতোরের রাণা রত্নসেনের দ্বিতীয় পত্নী পদ্মিনী ছিলেন অপরূপ সুন্দরী। দিল্লির সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি, রাণী পদ্মিনীর রূপের সুখ্যাতিতে মুগ্ধ হয়ে তাকে পাওয়ার জন্য চিতোর আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে চিতোরের রাণা রত্নসেন শহীদ হন এবং রাণী পদ্মিনী সতীত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যে জহরব্রতে আত্মহত্যা করেন।

আলোচ্য 'পদ্মাবতী' সূফী সাধন তত্ত্বের রূপক কাব্য। কাব্যে চিতোর অর্থে মানবদেহ, রত্নসেন অর্থে জীবাত্মা, পদ্মিনী অর্থে বিবেক ও শুক পাখি ধর্ম গুরুর প্রতীক। দ্বিতীয়ত - কাব্যে প্রেম ও বিরহ লৌকিক হলেও প্রকৃতপক্ষে অধ্যাত্ম রসব্যঞ্জক। তৃতীয়ত - কাব্যটি উদার ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশিষ্ট। চতুর্থত - দক্ষতার সঙ্গে কবি রাজসভার ঐশ্বর্যের পরিচয় (যুদ্ধ, ঘোড়দৌড়, শিকার ইত্যাদি) দিয়েছেন। পঞ্চমত - সংস্কৃত ও লৌকিক উভয় কাব্যভাষাই ব্যবহৃত হয়েছে। ষষ্ঠত - ছন্দ, অলংকারে কবি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। যেমন - 'পদ্মাবতী সাক্ষাট রমণীকুল শোভা / মিহির প্রভাবে যেন নিশাকর প্রভা' (বাচ্য-উৎপ্রেক্ষা অলংকার)। সপ্তমত - কবির প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার বিচিত্র জীবন অভিজ্ঞতার পরিচায়ক। যেমন - ক) 'পড়শী হইলে শত্রু গৃহে সুখ নাই / নৃপতি হইলে ক্রোধ দেশে নাই ঠাঁই'। খ) 'তীক্ষ্ণ খড়্গ দেখিয়া জলের কিবা ভয় / ছেদিলে শতেক বার দুই খণ্ড নয়'।

সয়ফুলমূলক বদি-উজ্জমালঃ কাব্যটি কাজী সৈয়দ মসুদ শাহের উৎসাহে লেখা। কাব্যের বিষয় ইসলামীয় রোম্যান্টিক কাহিনি। কাব্যের নায়ক সয়ফুলমূলক এবং নায়িকা পরী বদি-উজ্জমাল। আখ্যানে এই দুই নায়ক-নায়িকার প্রেম দেখানো হয়েছে।

সপ্ত (হপ্ত) পয়করঃ আরাকানের সেনাপতি সৈয়দ মহম্মদের নির্দেশে আলাওল কাব্যটি লিখেছিলেন। আঞ্চলিক ভাষার প্রভাবে 'সপ্ত' > 'হপ্ত' উচ্চারিত হয়েছে। কাব্যটির মূল অবলম্বন নেজামি সমরকন্দের ফারসি ভাষায় লেখা। আখ্যানে রাজকুমার বাহরামের যুদ্ধ জয় ও তার সাত পত্নীর গল্প বর্ণিত হয়েছে। কাব্যের গল্প অংশ আকর্ষণীয় হলেও কাব্যমূল্য দুর্বল।

তোহফাঃ মাগন ঠাকুরের নির্দেশে কবি 'তোহফা' কাব্যটি লিখেছিলেন। কাব্যটি পয়তাল্লিশটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত এবং ইসলামী উপদেশের নীতি গ্রন্থ।

সেকেন্দারনামাঃ প্রধান অমাত্য নবরাজ মজলিসের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং নির্দেশে কবি আলাওল 'সেকেন্দারনামা' লিখেছিলেন। মূলকাব্য 'ইসকন্দরনামা' ফারসি ভাষায় লেখা নেজামি সমরকন্দের লেখা। কাব্যটির উপজীব্য আলেকজান্ডারের বিজয় কাহিনি।

সতী ময়না বা লোরচন্দ্রানীঃ কবি দৌলত কাজী-র লেখা 'সতী ময়না বা লোরচন্দ্রানী' কাব্যের অসম্পূর্ণ অংশ কবি আলাওল সমাপ্ত করেন। এই অংশে কবি আলাওলের প্রতিভা দৌলত কাজী-র তুলনায় কম নয়।

মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্য যখন দেবতাদের মহিমা কীর্তন করছিল, সেই পর্বে মানুষের কীর্তন তথা মানবতার কথা নিয়ে রোসাঙের রাজসভায় নতুন কাব্যধারার চর্চা শুরু হয়েছিল। এই কাব্য চর্চায় দৌলত কাজী প্রথম হলেও প্রধান কবি সৈয়দ আলাওল। কবি আলাওল ইসলামী কাহিনি ও ধর্মতত্ত্বের নানা গ্রন্থ মূল আরবি ও ফারসি থেকে অনুবাদ করেছিলেন — তবে সেগুলির ধর্মনিরপেক্ষতা বৌদ্ধ-হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের কাছেই সমাদৃত হয়েছে।

বাংলা মঙ্গালকাব্যের ইতিহাসঃ ধর্মমঙ্গাল

◎ মঙ্গালকাব্যঃ

প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের বদ্ধমূল বিশ্বাস জন্মেছিল — তাদের সুদিন বা দুর্দিনের নেপথ্যে আছেন একজন দেবতা বা দেবী। মানুষের এই বিশ্বাসেই দেবতার পূজার প্রচলন এবং মাহাত্ম্য-গাথার সূচনা। কাল্‌ক্রমে কবিরা সেই সমাজপ্রসূত কাহিনিকে কাব্যরূপ দিয়েছেন — এই কাব্যগুলিই 'মঙ্গালকাব্য'। প্রসঙ্গাত আর্যিরা যেখানেই সুন্দর বা শক্তিকে দেখেছিল, তাকেই দেবতার আসন দিয়েছিল। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের কথায় — 'খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ভারতচন্দ্রের কাল পর্যন্ত বঙ্গাসাহিত্যে যে বিশেষ এক শ্রেণীর ধর্ম বিষয়ক আখ্যানকাব্য প্রচলিত ছিল তাহাই বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে মঙ্গালকাব্য নামে পরিচিত।' (বাংলা মঙ্গালকাব্যের ইতিহাস)

◎ মঙ্গালকাব্যের সাধারণ লক্ষণঃ

মঙ্গালকাব্যগুলির তুলনামূলক আলোচনায় প্রাপ্ত সাধারণ লক্ষণগুলি হল —

১ ॥ বন্দনা, গ্রন্থ-উৎপত্তির কারণ, দেবখণ্ড ও নরখণ্ডে কাহিনির বিন্যাস।

২ ॥ বিষয় হিসাবে থাকবে চৌতিসা, বারমাস্যা, ফল-ফুল-বিহঙ্গোর তালিকা, ভোজ্য দ্রব্যের তালিকা, বিবাহের বিশদ বর্ণনা, যুদ্ধের বর্ণনা ইত্যাদি।

৩ ॥ দেবতারা স্বর্গলোক থেকে কাউকে শাপভ্রষ্ট করে পাঠাবেন মর্ত্যভূমিতে। অতঃপর নানা প্রতিকূলতা জয় করে উক্ত দেবতা বা দেবীর পূজা প্রচার করে আবার স্বর্গলোকে ফিরে যাবেন।

৪ ॥ সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা, পৌরাণিক দেব-দেবীর বর্ণনা, দিগবন্দনা, নারীগণের পতিনিন্দা ইত্যাদি বিষয়েও মঙ্গালকাব্যের আবশ্যিক উপাদান বলে গণ্য।

◎ অঞ্চলভেদে মনসা মঙ্গালকাব্যের শ্রেণিবিভাগ ও উল্লেখযোগ্য কবিঃ

ড. সুকুমার সেন বাংলাদেশে প্রচলিত মঙ্গালকাব্যগুলিকে অঞ্চলভেদে চারটি ভাগে বিভক্ত করেছেন —

ক ॥ পূর্ববঙ্গোর ধারাঃ বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব প্রমুখ কবি।

খ ॥ রাঢ় বঙ্গোর ধারাঃ বিপ্রদাস পিপলাই, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ প্রমুখ কবি।

গ ॥ উত্তরবঙ্গোর ধারাঃ জগজ্জীবন ঘোষাল, তন্ত্রবিভূতি প্রমুখ কবি।

ঘ ॥ বিহারের ধারাঃ লোককথায় বিচ্ছিন্নভাবে প্রচলিত কাহিনি।

বাংলা মঙ্গালকাব্যের ইতিহাসঃ ধর্মমঙ্গাল

মূলত রাঢ়বঙ্গোর ধারা 'ধর্মমঙ্গাল' কাব্য। 'ধর্মমঙ্গাল' কাব্যের দুটি কাহিনি পাওয়া যায় — হরিশচন্দ্র-রোহিতাশ্ব এবং লাউসেন। এই দ্বিতীয় কাহিনিটিই জনপ্রিয় তথা মূল কাহিনি।

☒ লাউসেন কাহিনিঃ

গৌড়েশ্বরের সামন্ত রাজা কর্ণসেন ঢেকুরগড়ের রাজত্ব করতেন। তার তত্ত্বাবধানে সোম ঘোষের পুত্র ইছাই ঘোষের সঙ্গো যুদ্ধে পরাজিত হন, তৎসহ তার ছয় পুত্র মারা যায় এবং সেই শোকে স্ত্রী-ও দেহত্যাগ করেন। গৌড়েশ্বর কর্ণসেনের প্রতি সহানুভূতিবশত তার সঙ্গো আপন শ্যালিকা রঞ্জাবতীর বিয়ে দেন — এই বিয়েতে শ্যালক মহামদের আপত্তি ছিল। বিবাহের দীর্ঘ দিন পর ধর্ম ঠাকুরের আর্শিবাদে লাউসেনের জন্ম হয়।

মহামদ ক্ষোভে শত্রুতা শুরু করে — এমনকি লাউসেনের সঙ্গোও চক্রান্ত শুরু করে। সে লাউসেনকে অপহরণ, বন্দী করা, বিপদসঙ্কুল পথে কামরূপে রাজস্ব আদায় করতে পাঠানো, সিমুলার রাজা হরিপালের কন্যা কানাড়াকে বিয়ে নিয়ে চক্রান্ত করে এবং শেষ পর্যন্ত নিজেই অজুহাত দেখিয়ে যুদ্ধ শুরু করে ও পরাজিত হয়েছে। এরপর মহামদ কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয় এবং লাউসেনের চেষ্টায় ও দেবতা ধর্মের কৃপায় মুক্তি পায়। পরবর্তিতে রঞ্জাবতী ও লাউসেন স্বর্গে ফিরে যায়। ধর্মের পূজার জন্য আদিত্য রামাই পণ্ডিতরূপে জন্মগ্রহণ করেন। সদাডোম ও

হরিশচন্দ্রের পালায় ওই রামাই পন্ডিতের কাহিনি বিবৃত হয়েছে। প্রসঙ্গাত হরিশচন্দ্রের পালাটি সব থেকে প্রাচীন (ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য)।

☐ ধর্মমঙ্গাল কাব্যের কবিঃ

সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতারা প্রায় কুড়ি জন 'ধর্মমঙ্গাল' কাব্যকারের সন্ধান পেয়েছেন। এই ধারার আদি কবি ময়ূর ভট্ট এবং অপর বিখ্যাত কবিরা হলেন — রূপরাম চক্রবর্তী, ঘনরাম চক্রবর্তী, রামদাস আদক, সীতারাম দাস, যদুনাথ রায়, খেলারাম, শ্যামপণ্ডিত, মাণিকরাম গাঙ্গুলি, সহদেব চক্রবর্তী প্রমুখ।

☐ শ্রেষ্ঠ কবির পরিচয়ঃ

'ধর্মমঙ্গাল' কাব্যের কবিদের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় ঘনরাম চক্রবর্তী। তাঁর কাব্যটি প্রথম মুদ্রিত হয়েছিল এবং উৎকর্ষেও সর্বাগ্রগণ্য।

কবি ঘনরামের 'শ্রীধর্মমঙ্গাল' কাব্যটি ১৭১১ সালে লেখা সম্পূর্ণ হয়েছিল। সমকালীন অন্যান্য মঙ্গাল কাব্যের মতো কবি কাব্য রচনায় স্বপ্নাদেশের কথা বলেননি। ঘনরামের কাব্যের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ —

১ ॥ ঘনরামের কাব্যে স্বভাবকবিত্বের সঙ্গো পাণ্ডিত্যের সংযোগ বিশেষভাবে লক্ষিত হয়।

২ ॥ কবির শব্দচয়ন অত্যন্ত মার্জিত এবং উন্নত রুচির পরিচায়ক। যেমন —

ক) 'করপুটে এ' সঙ্কটে কাতরে কিঙ্কর রটে
উর ঘটে পুর অভিলাষ ।'

খ) 'চকোর চকোরী নাচে চাহিয়া চপলা।
মনে হৈল নিকটে আইল মেঘমালা ॥'

৩ ॥ কবি সমাজ বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তাঁর গভীর সমাজবোধ কাব্যমধ্যে বিধৃত আছে। যেমন — 'রোগ ঋণ-রিপু-শেষ দুঃখ দেয় র'য়ে / হাতে শঙ্খ দেখিতে দর্পণ নাই খুঁজি ॥' ইত্যাদি।

৪ ॥ ঘনরাম অসংখ্য উদ্ভট শ্লোক সুন্দর ও সহজ বাংলায় অনুবাদ করে তাঁর কাব্যে যুক্ত করেছেন। যেমন —

ক) 'মৃত দেহ দাহ করে চিতার অনল।
সজীব শরীর সদা দহে চিন্তানল ॥'
- মূল রূপ ছিল 'চিন্তাচিন্তাদ্বয়োর্মধ্যে..'

খ) 'কুপুত্র হইলে কুলে কুলাঙ্গার কহে।
কুবৃক্ষ কোটরে অগ্নি উঠে বন দহে ॥'
- মূল রূপটি ছিল — 'একেনাপি কুবৃক্ষেণ ....)

৫ ॥ সমকালীন সমাজ থেকে বহু প্রবাদ-প্রবচন অন্তর্ভুক্ত করেছেন — আবার তাঁর কথায় প্রবাদে পরিণত হয়েছে।

৬ ॥ অসংখ্য পৌরাণিক কাহিনির প্রসঙ্গা যুক্ত করেছেন।

৭ ॥ চরিত্র সৃষ্টিতে মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের কথায় — 'লাউসেন ধর্মমঙ্গাল কাব্যের আদর্শ সৃষ্টি, কিন্তু কর্পূরই একমাত্র বাস্তব সৃষ্টি। ঘনরামের সামাজিক চরিত্র সৃষ্টির প্রয়াস কর্পূরের চরিত্রসৃষ্টিতে সুসঙ্গাত সৌন্দর্যে মণ্ডিত হইয়াছে।'

৮ ॥ মাত্রাবৃত্ত ছন্দের পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিশেষভাবে দেখা যায়।

৯ ॥ 'শ্রীধর্মমঙ্গাল' কাব্যটি ২৪টি পালা সমন্বিত — যা মঙ্গালকাব্যের রীতি অনুসারী।

১০ ॥ ঘনরামের কবিত্বের দ্বারা ভীষণ প্রভাবিত এবং সমৃদ্ধ হয়েছেন রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়।

'ধর্মমঙ্গাল' কাব্যধারায় ঘনরামের কৃতিত্বের সারস্বত মূল্যায়ণ করে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের লিখেছেন — 'চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যের ঐশ্বর্য-যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি যেমন ভারতচন্দ্র, ঘনরামও তেমনি ধর্মমঙ্গাল কাব্যের ঐশ্বর্য যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি।'

☐ 'ধর্মমঙ্গাল' কাব্য 'রাঢ়ের জাতীয় মহাকাব্য'

আলোচ্য 'ধর্মমঙ্গাল' কাব্যধারার আলোচনায় রাঢ় অঞ্চলের মানুষের জীবনের সামগ্রিক পরিচয়কে লক্ষ্য করে সমালোচক বলেছেন যে, ধর্মমঙ্গাল কাব্য রাঢ়ের জাতীয় মহাকাব্য। সাহিত্যের সংরূপ পদবাচ্যে 'জাতীয় মহাকাব্য' বিষয়টি আলোচনা সাপেক্ষ —

ক) ধর্মমঙ্গালের কাহিনি ইতিহাস প্রসিদ্ধ বীরত্বের আখ্যান। তৎসহ কাব্যটিতে সেই সময়ের রাজনৈতিক এবং সামাজিক ইতিহাসের পরিচয়ও পাওয়া যায়।

খ) কাহিনি 'বীর' রসাত্মক।

গ) কাব্যের নায়ক উচ্চ বংশজাত।

ঘ) আখ্যান স্বর্গ-মর্ত্য বিস্তৃত।

ঙ) অসংখ্য চরিত্র বিদ্যমান।

চ) মহাকাব্যের মতো গভীরতা এই কাব্যে নেই।

ছ) কাব্যটির ভাষা ছন্দ অলংকার অনেক নিম্নশ্রেণির।

জ) কাব্যের কাহিনি প্রাচীন নয়।

ঝ) জাতীয় জীবন নয় — একটি আঞ্চলিক সীমানায় জাতির জীবনের আখ্যান।

এবংবিধ আলোচনায় আমরা বলতে পারি প্রকৃত পরিচয়ে 'জাতীয় মহাকাব্য' হয়নি তবে সীমিত অঞ্চলের বা রাঢ়ের জাতীয় জীবনের কাব্য হয়ে উঠেছে।

প্রশ্নঃ 'ধর্মমঙ্গাল' কাব্যধারার পরিচয় দিয়ে শ্রেষ্ঠ কবির কৃতিত্ব মূল্যায়ণ কর । 'ধর্মমঙ্গাল'কে 'রাঢ়ের জাতীয় মহাকাব্য' বলার যৌক্তিকতা বুঝিয়ে দাও । / ধর্মঠাকুরের স্বরূপ বিশ্লেষণ করো । ধর্মমঙ্গাল কাব্যধারার উল্লেখযোগ্য দুজন কবির নাম লেখো । এই কাব্যধারার শ্রেষ্ঠ কবির কবিকৃতির আলোচনা করো । (২০১৫)

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসঃ কবিগান

'বাংলার প্রাচীন কাব্যসাহিত্য এবং আধুনিক কাব্যসাহিত্যের মাঝখানে কবিওয়ালাদের গান।' বাংলা সাহিত্যের 'যুগ সন্ধিক্ষণ' বা 'ক্রান্তিকালে' অর্থাৎ ভারতচন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পর থেকে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মধ্যবর্তী সময় পর্বে মধ্য যুগ ও আধুনিক যুগের সংযোগ ঘটিয়েছে 'কবিগান' বা 'কবি সংগীত'।

∇ 'কবিগানে'র গঠনশৈলীঃ

কবিগানে দুটি পক্ষের বিভক্ত হয়ে প্রশ্ন-প্রত্যুত্তরে এবং সংগীতের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়। এই গানে প্রথমে এক পক্ষ প্রশ্ন করে — যা 'চাপান' এবং দ্বিতীয় পক্ষ প্রত্যুত্তর দেয় — যা 'উতোর'। দুই পক্ষের মধ্যে যে দলের গান উৎকৃষ্ট হত, তাকে বিজয়ী ঘোষণা করা হত। এই গানগুলি সাধারণত মুখে মুখে রচনা করা হত, তবে পূর্বেও গান রচনা করার প্রথা আছে। অনেক কবিয়াল নিজের দুর্বলতায় গান 'বাঁধনদার'কে দিয়ে পূর্বেই গান লিখিয়ে নিতেন। কবিগানের বাদ্যজন্ত্র ছিল কাঁসর, ঢোল, বেহালা, হারমোনিয়াম এবং এই বাদ্যযন্ত্র বাদকেরা দোহারের কাজ করত।

কবিগান চার অঙ্গো বিভক্ত — মালসী বা ভবানী, সখী সংবাদ, বিরহ এবং খেউড় । সাধারণত কবিগানের আসরে দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী দলের উপস্থিতি আবশ্যিক ছিল। প্রথম দল 'ভবানী' বিষয়ে গান গেয়ে সখী সংবাদের অবতারণা করত — একে বলে 'চাপান' । অতঃপর প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বিতীয় দল 'সখী সংবাদে'র বিষয় নিয়ে এ'র উত্তর দিত — একে বলা হয় 'উতোর' (<উত্তর) । পরবর্তী বিষয় ছিল একান্তই লৌকিক বিরহ নির্ভর — এই অংশটি কবিগানের শ্রেষ্ঠ অংশ । কবিগানের সমাপ্তি হত অশ্লীল - অশ্রাব্য 'খেউড়' গান দিয়ে ।

∇ কবিগানের আবির্ভাব ও বিস্তারের ইতিবৃত্তঃ

বাংলাদেশের এক যুগ সন্ধিক্ষণের কালে কবিগানের আবির্ভাব ও বিস্তার ঘটেছিল । সময়ের দিক থেকে শুরু করে আধুনিক কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী পর্যন্ত সেই সংগীতের ধারা প্রবাহিত ছিল । সমাজের দিক থেকে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালে বাংলাদেশের আর্থ-সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটে — এই নতুন সমাজে রুচি বিবর্জিত স্থূল চাহিদার যোগান দিতেই কবিগানের রমরমা তৈরি হয় । রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'ইংরেজের নতুন সৃষ্ট রাজধানীতে পুরাতন রাজসভা ছিল না, পুরাতন আদর্শ ছিল না । তখন কবির আশ্রয়দাতা 'রাজা' হলেন সর্বসাধারণ নামক 'এক অপরিণত স্থূলায়তন ব্যক্তি' এবং সেই হঠাৎ রাজার সভার উপযুক্ত গান হল কবির দলের গান । তখন নতুন রাজধানীর নতুন সমৃদ্ধশালী কর্মশ্রান্ত বণিক সম্প্রদায় সন্ধ্যাবেলায় বৈঠকে বসে, দুই দন্ড 'মোদের' উত্তেজনা চাইত, তারা 'সাহিত্যের রস' চাইত না ।

∇ 'কবিগানে'র উৎপত্তিঃ

কেউ কেউ মনে করেন 'যাত্রা' থেকে 'কবিগানে'র উৎপত্তি হয়েছে । কারও মতে 'পাঁচালী' থেকে কবিগানের উৎপত্তি — বিপরীত মতে কবিগান ভ্রষ্ট হয়ে পাঁচালীর উদ্ভব হয়েছে । আসলে কবিগানের বিষয় প্রধানত রাধা-কৃষ্ণ লীলা বা শ্যামা বিষয়ক পদ এবং উপস্থাপন শৈলী উক্তি-প্রত্যুক্তি ভিত্তিক বাদানুবাদ । কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত শান্তিপুরে কবিগানের জন্মস্থান বলে নির্দেশ করেছেন। শান্তিপুর থেকে হুগলী চুঁচুড়া হয়ে কলকাতার নগর জীবনে কবিগান স্থান করে নিয়েছে।

∇ বাংলা কবিয়াল পরিচয়ঃ

বাংলা 'কবিগানে'র ধারায় আদি কবিয়াল হলেন গোজলা গুঁই । অন্যান্য জনপ্রিয় কয়েকজন কবিয়াল হলেন — রাম বসু, হরু ঠাকুর, জয় নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গদাধর মুখোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস চক্রবর্তী, নিত্যানন্দ বৈরাগী, এন্টনি ফিরিঙ্গি প্রমুখ । প্রসঙ্গত আধুনিক গীতিকবিতার যুগে কবিগানের স্থান-চ্যুতি ঘটেছে। তবে কবিগানের কদর শেষ হয়ে যায়নি। আজও গ্রামে গ্রামে কবিগানের সন্ধান পাওয় যায়। সাম্প্রতিক সময়ের কবিয়ালদের মধ্যে বিখ্যাত অসীম সরকার, অশ্বিনী সরকার প্রমুখ।

কবিয়াল গোজলা গুঁইঃ কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মতে কবিগানের ধারার আদি কবিয়াল গোজলা গুঁই। সম্ভবত তিনি ১৭০৪ থেকে ১৭১৪ সালের মধ্যে জীবিত ছিলেন। তাঁর গানের অল্প কয়েকটি সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁর তিন জন শিষ্য ছিল — লালু নন্দলাল, রঘুনাথ দাস, রামজীবন দাস।

কবিয়াল হরু ঠাকুরঃ কবিয়াল হরেকৃষ্ণ দিঘাড়ী (১৭৩৮-১৮১২) হরু ঠাকুর নামে পরিচিত। তিনি মহারাজ নবকৃষ্ণের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন। তিনি নিজেই ছিলেন রচনাকার, সুরশিল্পী, গায়ক। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মতে হরু ঠাকুর কবিগানের চারটি ধারাতেই (ভবানী বিষয়ক, সখী সংবাদ, বিরহ, খেউর) দক্ষ ছিলেন।

কবিয়াল নিতাই বৈরাগীঃ নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী (১৭৫৪-১৮২১) কবি সমাজে নিতাই বৈরাগী নামে পরিচিত। তিনি বৈষ্ণব কাহিনি ও পুরান বিষয়ে কবিয়াল হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তবে তাঁর দুইজন গান বাঁধনদার ছিল — গৌর কবিরাজ ও নবাই ঠাকুর। তিনি কবিগানের চারটি অঙ্গের গানেই পারদর্শী ছিলেন।

কবিয়াল রাম বসুঃ বাংলা কবিগানের পুরাতন যুগের ধারায় শেষ ও শ্রেষ্ঠ কবিয়াল রামমোহন বসু (১৭৮৬-১৮২৮) বা রাম বসু। রাম বসু থেকেই কবির লড়াই অকৃত্রিম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উন্নীত হয়। কবিগানের সব ধারাতেই তিনি গান করতেন তবে আগমনী ও বিরহের গানেই তাঁর বেশি খ্যাতি ছিল। মানবমুখী বাস্তবতা তাঁর গানের বৈশিষ্ট্য। তাঁর গানের প্রধান সুর হল নায়কের বিরহে, বঞ্চনায়, প্রত্যাখ্যানে নায়িকার আর্তি।

কবিয়াল ভোলা ময়রাঃ কবিয়াল ভোলা নায়ক পারিবারিক জীবিকা ময়রা বা মোদক বা মিষ্টির কারিগর হয়েও মনে-প্রাণে ছিলেন কবিয়াল। তিনি ছিলেন কবিয়াল হরু ঠাকুরের প্রিয় শিষ্য। প্রতিপক্ষের 'চাপান'-এর উত্তরে তাঁর জবাবী গানের চটকদারী জবাবের জন্য তিনি জনপ্রিয় ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বলেছিলেন — 'বাংলা দেশের সমাজকে সজীব রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে রামগোপাল ঘোষের ন্যায় বক্তার, হুতোম প্যাঁচার ন্যায় রসিক লোকের এবং ভোলা ময়রার ন্যায় কবিয়ালের প্রাদুর্ভাব হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।'

এন্টনি ফিরিঙ্গিঃ এন্টনি ফিরিঙ্গি জাতিতে পোর্তুগীজ খ্রিস্টান ছিলেন এবং এক বিধবা ব্রাহ্মণীকে বিয়ে করে বাঙালি হয়েছিলেন। তিনি সম্ভবত আঠারো শতকের শেষে ফরাসডাঙ্গায় জন্মেছিলেন এবং ১৮৩৬ সালে প্রয়াত হয়েছিলেন। তাঁর গানে ভক্ত বাঙালির মানসিকতা গভীর ছাপ ফেলেছিল। তৎকালীন বিভিন্ন বাঙালি কবিয়ালের দ্বারা তিনি অসম্মানিত (ভোলা ময়রা) হলেও ভক্তি, কথার বিনয়ে ও সংগীতের দ্বারা নিজের সম্মান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

কবিগানের মূল্যায়ণে ড. আহমদ শরীফের মন্তব্য তাৎর্প্যপূর্ণ। তাঁর কথায় — 'তাঁদের (কবিওয়ালা) সর্ববিষয়ক জ্ঞান তথা সর্ববিদ্যায় ব্যুৎপত্তি, তাঁদের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, তাঁদের ন্যায়-প্রয়োগ পটুতা, তাঁদের তর্কনিষ্ঠা, বাকপটুতা, বাকপ্রতিমা নির্মাণে আর্শ্চয্য কৌশল এবং পদ রচনার বিস্ময়কর দ্রুততা আমাদের অভিভূত করে। দুই প্রতিপক্ষের বিতর্কে ও যোটকে সত্য উদ্ভাসনের আশ্চর্য্য কুশলতা আমাদের বিস্ময়ের বিষয়। ... ... জগতের হেন বিষয় কমই আছে, যাতে তাঁদের বলার অধিকার নেই। এই নিরক্ষরেরা দেশে কবিয়ালরা তাই আজও লোকশিক্ষক, জনজীবনের চারণ কবি।'

বৈষ্ণব পদকারঃ চণ্ডীদাস

মধ্যযুগের বাঙালির প্রাণ যে কাব্যমার্গে আপনাকে উৎসারিত করেছিল তা হল 'বৈষ্ণব পদাবলী'। এই পদাবলী সাহিত্যের পদকারদের মধ্যে চণ্ডীদাস এবং বিদ্যাপতি প্রাচীনতম ও প্রধানতম কবি বা পদকারে সম্মানিত। চণ্ডীদাস নামে বিভ্রান্তি আছে — একজন বৈষ্ণব পদকার এবং অন্যজন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে'র স্রষ্টা বড়ু চণ্ডীদাস। বৈষ্ণব পদকার চণ্ডীদাসের জন্মস্থান বীরভূম জেলার সাকুলিপুর থানার অন্তর্গত নান্নুর গ্রামে। কবির পিতা বারেন্দ্র শ্রেণির ব্রাহ্মণ দুর্গাদাস বাদচী। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের মতে চণ্ডিদাসের জন্ম কাল ১৩৪০ শকাব্দ বা ১৪১৮ খ্রিস্টাব্দ। কবির উপাস্য দেবী হলেন বাশুলী (সরস্বতী)। কিংবদন্তী আছে রামী নামে এক ধোপানী কবির সাধনসঙ্গিনী ছিলেন। মধ্যযুগের একটি প্রবণতা ছিল রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্য চর্চা — কবি চণ্ডীদাস রাজসভার কবি নন, কোন পৃষ্ঠপোষকতাও পাননি। কবি চণ্ডীদাস মেঠো পথে মেঠো সুরে গান গেয়েছেন।

কবি চণ্ডীদাস চৈতন্য-পূর্ব যুগের কবি ছিলেন। তাই তাঁর সৃষ্ট পদগুলির মধ্যে বৈষ্ণবীয় পর্যায় রীতির অনুসরণ দেখা যায় না। তাঁর রাধার কোন বয়ঃসন্ধি দেখা যায় না। অপ্রাকৃত নারী হওয়ায় রক্ত-মাংসের যৌবন কামনার হাতে এই রাধা বন্দিনী নন। তৎসহ কবির সামনে রাধার আদর্শ প্রতিমূর্তি ছিল বীরভূমের কবি জয়দেবের 'শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্'। এই 'শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্' কাব্যের রাধা পূর্ণ বয়সের নারী এবং প্রেমের আরতি বা সাধনা বা কামগন্ধহীন প্রেমের উপাসিকা।

চণ্ডীদাসের রাধার 'পূর্বরাগ-অনুরাগ' পর্যায়ের প্রতিমূর্তি বৈরাগ্যম্যী তপস্বিনী। এই রাধা তাঁর সখীকে জিজ্ঞাসা করেছে —

'সই কে বা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥'

তার আশঙ্কা সেই নামধারীর 'অঙ্গোর পরশে কিবা হয়'। এমন বিহ্বল অবস্থায় রাধা যোগিনী বেশ ধারণ করে বিরলে বসে অনুক্ষণ কৃষ্ণধ্যান করছেন।

'অভিসারে'র পদে রাধা বাংলাদেশের ভীরু কূলবধূ। তার চারপাশে শাশুড়ী-ননদীর কড়া প্রহরা। এই প্রহরা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ পেরিয়ে রাধা মিলন কুঞ্জে যেতে না পারলে প্রিয়ত্ম কৃষ্ণ তার বাড়ির আঙিনাতেই উপস্থিত হয়েছে। কৃষ্ণকে দেখে —

'আঙিনার মাঝে বঁধূয়া তিতিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে।'

এই কৃষ্ণ মিলনের পর রাধাকে ত্যাগ করেনি। গমনোদ্যত হয়েও ফিরে এসেছে, রাধার মুখ চুম্বন করেছে এবং যাবার সময় বারবার ফিরে ফিরে তাকিয়ে দেখেছে রাধাকে।

'আক্ষেপানুরাগে' চণ্ডীদাস শ্রেষ্ঠ কবি। এই পর্যায়ে দেখা যায় কঠোর সমাজ-ব্যবস্থার চাপে প্রেম-বিহ্বল রাধা দিশেহারা। এখন তার আক্ষেপ —

'সই কে বলে পিরীতি ভালো।
হাসিতে হাসিতে পিরীতি করিয়া
কাঁদিতে জনম গেল ॥'

'প্রেমবৈচিত্ত্য' পর্যায়ে দেখা যায় দেহ মিলনের চরম সুখে তাঁদের রাত্রিযাপন, অথচ প্রাতঃকালে সাময়িক বিচ্ছিন্নতার আশঙ্কায় দু'জনেই বিরহ পীড়িত। আবার 'খণ্ডিতা ও কলহান্তরিতা' পর্যায়ে এই রাধা, প্রিয়তম কৃষ্ণকে ব্যঙ্গাবাণে বিদ্ধ করেছে। এই ব্যঙ্গে রাধার মানসিক যন্ত্রণাও ফুটে উঠেছে। রাধার কথায় —

'সে হেন কালিয়া না চাহে ফিরিয়া
এ মতি করিল যে।
আমার অন্তর যেমতি করিছে
তেমতি হউক সে॥'

চণ্ডীদাসের রাধার পরিসমাপ্তি 'আত্মনিবেদনে'। এই পর্যায়ে পৌঁছে রাধার মনে কোন দ্বিধা নেই, নেই অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা। রাধা কূল-মান-লজ্জা-শরম জলাঞ্জলি দিয়ে বলে উঠেছে —

'বঁধূ তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি তোমারে সঁপেছি
কুলশীল জাতি মান॥'

প্রিয়তমের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করে রাধা প্রার্থনা করেছে —

'বঁধূ, কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি॥'

পদকার চণ্ডীদাসের ব্যক্তিগত প্রবণতা ও ধর্মবোধ তাঁর সৃষ্ট পদাবলীতে উজ্জ্বল্ভাবে প্রস্ফুটিত। রবীন্দ্রনাথের কাব্যিক মূল্যায়নে —

'হেরো হেরো মোর অকূল অশ্রুর
সলিল-মাঝে
আমি এ অমল কমলকান্তি
কেমনে রাজে।
একটিমাত্র শ্বেতশতদল
আলোক-পুলকে করে ঢলঢল
কখন ফুটিল বল্ মোরে বল্
এমন সাজে
আমার অতল অশ্রু-সাগর-
সলিল মাঝে।'

'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি' গ্রন্থে শঙ্করীপ্রসাদ বসু-র মূল্যায়নে — 'চণ্ডীদাস কবি-তাপস। এত অনাবরণ অনির্বাণ আত্মবান কবি আর কে ! প্রেম যে দ্রবীভূত হৃদয়, কান্না যে বিগলিত নয়ন, এবং হাসি যে ছলোছলো আত্মা — চণ্ডীদাসই তাহা জানাইয়াছেন। .. .. চণ্ডীদাসের পদে করুণ মরণের সন্ধ্যাছায়ায় অমর প্রেমের দীপশিখা।'

বৈষ্ণব ষড় গোস্বামী

ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়ম্ — ধর্ম-সম্পর্ক এই অভিযোগ প্রাচীন যুগে স্বীকৃত হলেও দেখা যায়, শ্রেষ্ঠ ধর্ম শুধু ব্যক্তিগত উপলব্ধিতেই নিঃশেষিত নয়। সমাজ ও সাধারণের প্রয়োজনে তার প্রচার বা প্রকাশ যে-কোনো ধর্ম বিকাশের একটি অন্যতম শর্ত। তাই অবতারকল্প ধর্মাচার্যের পাশাপাশি দেখা যায় তার অনুচর-পরিকরদের পুণ্য আবির্ভাব। এই প্রচার প্রকাশ পায় প্রধানত দুভাবে—তত্ত্বগ্রন্থ প্রণয়নে এবং তাঁদের অনুসৃত আচরণে। স্বয়ং ধর্মাচার্যের মতোই গুরুত্বপূর্ণ তাদের ভূমিকা। গৌতম বুদ্ধের মুখ থেকে সদ্ধর্মের প্রথম বাণী শুনেছিলেন পাঁচজন—অন্ন-কোদন্ন, ভাপ্পা, মহানাম, ভদ্য, অশ্যাপি। শঙ্করাচার্যের বাণীবাহক ছিলেন চারজন— হস্তামলক, পদ্মপাদ (সনন্দন), সুরেশ্বরাচার্য (মণ্ডন মিশ্র), তোটকাচার্য। আর শ্রীচৈতন্যের প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের স্বীকৃত গোস্বামী হলেন ছ'জন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থেই সর্বপ্রথম পাওয়া যায় তাঁদের নাম—

"শ্রীরূপ সনাতন আর ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥"

প্রকৃতপক্ষে, গ্রন্থের সূচনাতেই 'এই ছয় গুরু শিক্ষাগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন তিনি অকুণ্ঠ। শ্রীচৈতন্যকে কেন্দ্র করে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের যে প্রসারলাভ এটি সাধারণ সত্য। কিন্তু এই ধর্মের 'কায়ব্যূহ' নির্মাণে সমকালে এবং অনতি-পরবর্তীযুগে এই ষড় গোস্বামীর অবদান সীমাহীন। অবশ্য তথ্যগত সাক্ষ্যে, সকলের অবদান সমানভাবে প্রত্যেক চরিতসাহিত্যে স্বীকৃত হয়নি (বিশেষত রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও গোপাল ভট্ট)। সম্ভবত গ্রন্থকার হিসাবে অল্পপরিচিতি, তাঁদের স্বল্পোল্লেখের কারণ।

❖ **রঘুনাথভট্ট গোস্বামী :**

মহাপ্রভুর এই আদেশ শিরোধার্য করেই গোস্বামী রঘুনাথভট্টের ধর্মজীবনের পথে পদক্ষেপ। তাঁর পিতা তপন মিশ্র চৈতন্যদেবের প্রথম ভক্ত। যিনি পূর্ববঙ্গে প্রভুর অবস্থানের সময়ে সাধ্য সাধন সম্পর্কে তত্ত্বোপদেশ পান। পরে সপরিবারে কাশীবাসী হন। মুরারি গুপ্তের কড়চা থেকে জানা যায় বালক বয়সেই রঘুনাথের মহাপ্রভুর কৃপালাভ। বয়ঃপ্রাপ্তির পর নীলাচলে উপস্থিত হয়ে আটমাস চৈতন্য সঙ্গ লাভ করেন। তিনি তাঁকে "বিবাহ না করিহ বলি নিষেধ করিলা"। তারপর আরো চারমাস কাশীতে এবং পিতা-মাতার মৃত্যুর পর আটমাস নীলাচলে কাটিয়ে তিনি উপস্থিত হন বৃন্দাবনে। যাত্রার পাথেয় সম্মান রূপে পান প্রভুর হাত থেকে "চৌদ্দ হাত জগন্নাথের তুলসীর মালা", যেটি তাঁর তিরোধান মুহূর্ত পর্যন্ত সঙ্গে ছিল। সুকণ্ঠ ভাবুক ভক্ত রঘুনাথের খ্যাতি গ্রন্থরচনায় নয়, নির্লোভ নিরহঙ্কার বৈষ্ণব যতিজীবনের আদর্শ অনুসরণে এবং সাঙ্গীতিক প্রতিভায়। "পিকস্বর কণ্ঠ তাহে রাগের বিভাগ এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় তিন চারি রাগ"—ভাগবত পাঠের এই খ্যাতি ও চরিত্রের মহত্ত্বের জন্যই হয়ত অম্বরাধিপতি মানসিংহের মতো ব্যক্তি তাকে গুরুপদে স্বীকার করেছিলেন। হতে পারে এটি অনুমান, কিন্তু ব্যক্তিজীবনের পুণ্য পথরেখা ধরেই যে ধর্মজীবন মূর্ত হয়ে উঠেছিল, এ তথ্য মিথ্যা নয়।

❖ **গোপালভট্ট গোস্বামী :**

ষড়গোস্বামীর মধ্যে গোপাল ভট্টের স্থান জন্ম এবং ব্যক্তিপরিচয় নিয়ে বৈষ্ণবশাস্ত্রের এবং সাহিত্যের ইতিহাসে জল্পনা-কল্পনার অন্ত নেই। তার কারণ—

(ক) প্রথমত, তার সম্পর্কে প্রচারিত দ্বৈত-পিতৃনামের অস্তিত্ব-যার মূলে নিহিত কবিরাজ গোস্বামীর অনাবধানতা। "চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যখণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে এবং মধ্যলীলার নবম পরিচ্ছেদে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে মহাপ্রভুর আশ্রয়দাতা গৃহকর্তা রূপে যথাক্রমে ত্রিমল্ল ভট্ট এবং বেঙ্কটভট্টের নাম পাওয়া যায়। তারই ভিত্তিতে 'ভক্তিরত্নাকরে'র

লেখক নরহরি চক্রবর্তীর সিদ্ধান্ত, গোপাল ভট্ট বেঙ্কট ভট্টের পুত্র; অন্যদিকে মনোহর দাস তার 'অনুরাগবল্লী' গ্রন্থে তাঁকে ত্রিমল্ল-পুত্র বলে পরিচয় দিয়েছেন।

(খ) গোপাল ভট্ট সম্পর্কে সংশয়ের দ্বিতীয় কারণ, বৈষ্ণব গ্রন্থাকারদের আশ্চর্য নীরবতা। কবি কর্ণপুর, বৃন্দাবন দাস, লোচন ও জয়ানন্দ প্রমুখ চরিতকারগণের রচনায় তার পরিচয় অনুপস্থিত। একমাত্র কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও মুরারি গুপ্তের গ্রন্থে তাঁর সম্বন্ধে শুধু নামোল্লেখ মাত্র পাওয়া যায়। অথচ ষোড়শ শতকের শেষভাগে রূপ সনাতনের পর বৃন্দাবনে তিনি গুরুরূপে বহুমানিত। শ্রীনিবাস আচার্য তার মন্ত্রশিষ্য। কবিরাজ গোস্বামী তাঁরই অনুমতি নিয়ে গ্রন্থরচনা শুরু করেছিলেন।

(গ) 'হরিভক্তিবিলাস' গ্রন্থকে কেন্দ্র করে তৃতীয় সমস্যার শুরু। ১২৮৯ বঙ্গাব্দে রামনারায়ণ বিদ্যারত্নের সহায়তায় যখন গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় তখন রচয়িতারূপে গোপাল ভট্টের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু জীব গোস্বামী প্রদত্ত গ্রন্থতালিকায় (লঘুবৈষ্ণবতোষণী'তে) আলোচ্য রচনাটি এবং 'দিগ্‌দর্শনী' টীকা গ্রন্থটির লেখকরূপে সনাতন গোস্বামীর নাম দেখা যায়। সুতরাং গোস্বামী গোপাল ভট্ট না সনাতন গোস্বামী—এই দুই স্মরণ্য আচার্যের মধ্যে কে এই গ্রন্থের প্রকৃত রচয়িতা তা সমস্যাচ্ছন্ন। তাছাড়া, মূল গ্রন্থের মধ্যেও বৈষ্ণবধর্মের আচার-অনুষ্ঠানের নির্দেশ প্রসঙ্গে দীক্ষাদানে তান্ত্রিক নিয়ম পালনের উল্লেখ, রাসযাত্রা, রাধাকৃষ্ণ, চৈতন্যমূর্তি পূজা প্রভৃতি বিষয়ে নীরবতা ক্রমাগত সংশয় জাগায়।

(ঘ) সুশীল কুমার দৌর গোপাল ভট্ট নামে দ্রাবিড় দেশবাসী নৃসিংহের পৌত্র এবং হরিবংশ ভট্টের পুত্রের উল্লেখ সংবাদে (Vaishanava Faith & Movement') তার সম্পর্কে চতুর্থ সমস্যার সূত্রপাত হয়। উল্লিখিত এই ব্যক্তি চৈতন্যতত্ত্বে প্রাজ্ঞ। এঁর রচিত 'কালকৌমুদী', 'কৃষ্ণবল্লভী' ও 'রসিকরঞ্জিনী' নামক তিনটি গ্রন্থে তার পরিচয় স্পষ্টরেখ। বাঙলাদেশের বৈষ্ণব মতাদর্শের সঙ্গেও এর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল।

(ঙ) আবার জীব গোস্বামীর 'যসন্দর্ভ' গ্রন্থে দক্ষিণী ভট্ট নামক ভক্ত ব্যক্তির উল্লেখ দেখে অনেকের অনুমান, এই দক্ষিণী ভট্ট ও গোপাল ভট্ট অভিন্ন ব্যক্তি।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের তত্ত্ব, আদর্শ ও দর্শনের মননশীল ভিত্তি প্রতিষ্ঠার সর্বাধিক অবদান প্রধানত তিনজনের—সনাতন, রূপ ও শ্রীজীব গোস্বামীর। বৃন্দাবনের কবি ও ভক্তসম্প্রদায় তাঁদেরই নির্দেশিত চিন্তাধারার অনুগামী হয়েছেন।

❖ রূপ গোস্বামী :

সনাতন, রূপ ও তাঁদের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব গোস্বামীর পূর্বপুরুষেরা ছিলেন কর্ণাট অঞ্চলের সুপণ্ডিত ও সম্পন্ন ব্যক্তি। সেই বিত্ত ও বিদ্যার উত্তরাধিকার পরবর্তীকালে গৌড়ের রামকেলিগ্রামে বসবাসী তাঁদের বংশধরেরা রীতিমত চর্চায় আয়ত্ত করেছিলেন। শুধুমাত্র সনাতনের ছ'জন গুরুর কাছে শিক্ষালাভের সংবাদ পাওয়া যায়। রূপ এবং সনাতন, দুইজনেই সংস্কৃত ও বাংলা ভাষা ছাড়া আরবী এবং ফার্সি ভাষা শিখেছিলেন। বিত্তের ক্ষেত্রেও তারা অসামান্য সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। সনাতন গোস্বামী ছিলেন গৌড় সুলতান হোসেন শাহের 'দবীর খাস' অর্থাৎ ব্যক্তিগত সচিব। তার ভাই রূপ গোস্বামী ছিলেন 'সাকর মল্লিক' বা রাজস্ব বিভাগের অধিকর্তা। যশোহর জেলার যুসুর ও চেঙ্গুটিয়া পরগনা এই ভাইদের দখলে ছিল। এজন্য তারা সুলতানকে কিছু রাজস্বও দিতেন। শ্রীচৈতন্যের ডাকে তাঁদের গৃহত্যাগ, গৃহবন্দী দশা থেকে মুক্তি লাভ করার জন্য অর্থ বিতরণের কাহিনী রীতিমত রোমাঞ্চকর এবং সর্বজনপরিচিত ঘটনা। শোনা যায়, সনাতন ও রূপের নাম শ্রীচৈতন্যেরই দেওয়া, পূর্বজীবনে তাদের নাকি নাম ছিল সন্তোষ (সনাতন) ও অমর (রূপ)। অনেকের অনুমান, তাঁরা ছিলেন 'পিরালী' মুসলমান (বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়)। কিন্তু এর পেছনে যথেষ্ট যুক্তি অনুপস্থিত। রূপ সনাতনের মতো মান্যজন যখন বলেন—

"নীচজাতি নীচ সঙ্গী করি নীচ কাজ।
তোমার অগ্রেতে প্রভু! কহিতে বসি লাজ ।"

তখন একে বৈষ্ণবের দুর্লভ বিনয়োক্তি বলে ভাবাই সঙ্গত, মুসলমান সুলতানের অধীনে চাকরীর জন্য পাতিত্যদোষও হতে পারে। বৈষ্ণব ধর্মের গবেষক রমাকান্ত চক্রবর্তী 'বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, "এত বড় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এবং সাহিত্যিক হলেও নবদ্বীপের প্রতিক্রিয়াশীল পণ্ডিত সমাজে সম্ভবত 'যবন'দের সঙ্গে থাকার জন্যেই রূপ-সনাতনের কোনও স্থান ছিল না। চৈতন্যই তাদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন (প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯৬, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা ৫২)। এঁরা দুই ভাই চূড়ান্ত দরিদ্রের জীবনযাপন করেন।

মঙ্গলকাব্য

উত্তরবঙ্গের মনসামঙ্গল কাব্যধারাঃ তন্ত্রবিভূতি ও জগজ্জীবন ঘোষাল

নদীমাতৃক বাংলাদেশের জল-জঙ্গল সর্বত্র সাপের উপযুক্ত বাসস্থান এবং সেই অনুসঙ্গে দেবীমাহাত্ম্যের বিস্তার ঘটেছিল। পূর্ববঙ্গে যিনি দেবী পদ্মা তিনিই রাঢ় বঙ্গে মনসা ও উত্তরবঙ্গে মনসা ও পদ্মা নামে পরিচিত। উত্তরবঙ্গের কবিদের মধ্যে তন্ত্রবিভূতি এবং জগজ্জীবন ঘোষালই প্রধান। এছাড়া উল্লেখযোগ্য কবি হলেন জীবন মৈত্র প্রমুখ।

∇ তন্ত্রবিভূতিঃ

কবি তন্ত্রবিভূতির কাব্যটি মালদা জেলা থেকে ড. আশুতোষ দাস আবিষ্কার করেছিলেন। তন্ত্রবিভূতি, আনুমানিক ১৬শ শতকের শেষ বা ১৭শ শতকের প্রথমদিকের কবি ছিলেন। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ হলেও তান্ত্রিক ছিলেন — তাই কাব্যের সর্বত্র তান্ত্রিক ধর্মবিশ্বাসের প্রভাব সুস্পষ্ট। তাঁর কাব্যই উত্তরবঙ্গের মনসামঙ্গাল কাব্যধারার 'ভিত্তি স্বরূপ'।

মঙ্গাল কবিদের অনুসরণ করে তন্ত্রবিভূতি স্বপ্নাদেশে কাব্য রচনার কথা বলেছেন —

'পদ্মার আদেশে গীত পাইল স্বপনে।
তন্ত্রবিভূতে গায় মনসার চরণে ॥'

তিনিও 'দেববন্দনা' করে কাব্য আরম্ভ করেছেন। মনসার আবাহন, ধর্মকে স্মরণ ও বন্দন, মনসার বন্দনা এবং সবাহন দেবদেবীর বন্দনা ইত্যাদি অভিনবত্বে এবং কবির শব্দ চয়নের সামর্থ্যে চিত্তাকর্ষক। তাঁর বন্দিত মনসা 'চতুর্ভুজ মূর্তি পদ্মা দেখিতে সুন্দর'। কাব্যে ক্ষীরোদ সাগরের উদ্ভবের বর্ণনা পুরাণ অনুসারি হলেও কবি প্রতিভাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। মালাবতীর কাহিনি কবির নিজস্ব সৃষ্টি এবং উত্তরবঙ্গের মনসামঙ্গালে অভিনব। সেইসঙ্গে সমকালীন সমাজজীবনকে কবি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। যেমন — সাগরের অষ্ট অলংকার প্রভৃতি উপহার ও বিবাহে উপঢৌকনদানের বর্ণনা।

মনসার সঙ্গে চাঁদ সদাগরের বিবাদে কবি নিপুন কথাচিত্র এঁকেছেন —

'চান্দ বোলে কানী সহায় শূলপাণি
ডর নাহি তোর অহংকারে।
প্রতিজ্ঞা শুনহ মোর সংসারের ভিতর
নাহি দিব পূজা করিবারে ॥'

কাব্যে চাঁদ সদাগরের সৈন্যদের সঙ্গে মনসার যুদ্ধের বর্ণনায় অতীত বাংলার শৌর্যচেতনার পরিচয় ফুটে উঠেছে। কল্পনা ও মানবীয় সহানুভূতির সামর্থ্যে তন্ত্রবিভূতি উচ্চস্তরের কবিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বেহুলার রূপ এবং বিবাহের বেশ বর্ণনায় কবি বিশেষ প্রশঙসার পরিচয় দিয়েছেন। রূপসী বেহুলাকে কুলক্ষ্মী বলে সনকা তিরস্কার করলে প্রত্যুত্তরে তেজোদৃপ্ত উক্তিতে বলেছে —

'বেহুলা বোলেন মাও কি করিবে রূপে।
দেবতা মনুষ্যে বাদ খাইল পদ্মার সাপে ॥
তৈল ঘৃত থাকিতে প্রদীপ নিভাইল।
শ্বশুরের কারণে প্রাণনাথ হারাইল ॥
এমত শুনিএ নাই বড় অসম্ভব।
মনুষ্য হইয়া করে দেব সঙ্গে বাদ ॥'

কবি তন্ত্রবিভূতির কাব্যে প্রচুর তৎসম শব্দের ব্যবহার দেখা যায় — আঞ্চলিক ভাষার পাশে এই মিশ্রণ কিঞ্চিত গুরুচণ্ডালি হলেও তাঁর কবিত্ব প্রশঙসনীয়। গবেষক ড. আশুতোষ দাসের মূল্যায়ণে — 'তন্ত্রবিভূতির রচনায় মনোহারিত্ব আছে, তাঁহার বৈদগ্ধ্য কেবল কবির আত্মপ্রশস্তিতে নয়, বাণী-বয়নশিল্পেও সমর্থিত। ... ...

ড. অসিত বিশ্বাস, বাংলা বিভাগ, শ্রী অগ্রসেন মহাবিদ্যালয়

কবিত্ব শক্তিতে তিনি প্রায় প্রথম শ্রেণির মনসা-মঙ্গালের কবিদের সমগোত্রীয়।' উত্তর বাংলার প্রায় সকল মনসা-মঙ্গাল কাব্যের কবিই তন্ত্রবিভূতির কাব্যে প্রভাবিত হয়েছে এবং 'আত্মস্মাৎ'ও করেছে। তাই আশুতোষ ভট্টাচার্য্যের প্রশঙসায় — 'তাঁহার কাব্যকে উত্তর বাংলার মনসা মঙ্গাল কাব্যের ভিত্তি বলা যায়।'

∇ জগজ্জীবন ঘোষালঃ

দিনাজপুর জেলার কোচ আমোরা বা কুড়িয়া মোড়া গ্রামের জগজ্জীবন ঘোষাল বাস করতেন। তিনি দিনাজপুরের রাজা প্রাণনাথের (১৬৮৭) সমসাময়িক ছিলেন। অর্থাৎ কবি ১৭শ শতকের শেষে বা ১৮শ শতকের প্রথমদিকে কাব্যটি লিখেছিলেন। মালদা জেলার সিমলা দুর্গাপুর থেকে সুরেশচন্দ্র ভট্টার্চায্য জগজ্জীবন ঘোষালের 'মনসা মঙ্গাল' পুথিটি আবিষ্কার করেছিলেন এবং আশুতোষ দাসের সঙ্গো যৌথ সম্পাদনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দুই খণ্ডে প্রকাশিত (১৯৬০) হয়েছিল।

জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যটি দুটি খণ্ডে বিন্যস্ত — দেব খণ্ড এবং বণিক খণ্ড। দেব খণ্ডের প্রথমে কবি ধর্মমঙ্গালের সদৃশ পৃথিবীর সৃষ্টির কথা বর্ণনা করেছেন। যেমন —

'জলের উপর নির্মাইল নিরঞ্জন।
এক মন দিয়া শুন সৃষ্টির পত্তন॥
অনাদি আদেশ কৈল শুন চারি ভাই।
প্রলয় ঘুচাঞা সৃষ্টে মন কর ভাই॥'

এখানে মনসার দুই জন্মের প্রসঙ্গা আছে — প্রথম জন্মে ধর্মের পত্নী এবং দ্বিতীয় জন্মে গৌরী হয়ে শিবের ঘরণী হয়েছেন।

কবি, বণিক খণ্ডে পূর্বজ কবি তন্ত্রবিভূতিকে বিশেষভাবে অনুসরণ করেছেন। এই খণ্ডে লখীন্দরের বিবাহ প্রসঙ্গো কবি ভিন্ন গল্প শুনিয়েছেন। এখানে মা সনকা পুত্রের বিয়ে দিতে চায়নি তাই লখীন্দরকে কাম লিপ্সু চরিত্রহীন করে দেখানো হয়েছে। অতঃপর বিবাহের আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া বেহুলার একনিষ্ঠ পাতিব্রত্য, চাঁদের প্রচণ্ড বিরোধী মনোভাব ও পরে ভক্তির আতিশয্য ইত্যাদি প্রায় গতানুগতিক পরিচয় দিয়েছেন।

জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যে উত্তর বাংলার স্থানীয় জীবনচিত্র, পরিবেশ, আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। কাব্যটিতে অশ্লীলতার প্রসঙ্গা থাকলেও কবি সংস্কৃত-পুরাণ-অলংকার জানতেন। কবির বর্ণিত সৃষ্টি তত্ত্বের সঙ্গো শূণ্য পুরাণের এবং নাথ সম্প্রদায়ের বর্ণিত সৃষ্টি তত্ত্বের সাদৃশ্য আছে।

মনসা মঙ্গাল কাব্য ধারায় তন্ত্রবিভূতি এবং জগজ্জীবন ঘোষালের পুথি দুটির ঐতিহাসিক মূল্য বিদ্যমান। এই দুই পুথি থেকে মধ্য যুগীয় বাংলাদেশে গড়ে ওঠা মনসা মঙ্গাল ধারার সঙ্গো উত্তর বাংলার স্বাতন্ত্র্য এবং নিজস্ব পরিচয় প্রমাণিত হয়।

ড. অসিত বিশ্বাস, বাংলা বিভাগ, শ্রী অগ্রসেন মহাবিদ্যালয়

রাঢ় বঙ্গের মনসামঙ্গালের ধারা ও কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ

বাংলাদেশের নদী-জল-মাটির সঙ্গে মিশে থাকা সাপ ও অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসাকে নিয়ে গড়ে ওঠা রাঢ় বঙ্গের কাব্য ধারার কবি ছিলেন কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ। তিনি ব্যক্তি পরিচয়ে রাঢ় অঞ্চলের হয়েও সমগ্র বাংলাদেশের জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। মনসামঙ্গালের প্রায় প্রত্যেক পদ-সংগ্রাহকই তাঁর পদ সংগ্রহ করেছিলেন।

কবির জন্ম বর্ধমান জেলার কাঁদড়া গ্রামের প্রসিদ্ধ কায়স্থ বংশে। তাঁর পিতার নাম শঙ্কর ; তিনি দক্ষিণ রাঢ়ের অন্তর্গত সেলিমাবাদ সরকারের শাসনকর্তা বারা খাঁ-র অধীনে চাকরি করতেন। কবির কাব্যটি এই বারা খাঁ-র মৃত্যুর (১৬৪০) পর লেখা হয়েছিল এবং ১৮৪৪ সালে প্রকাশিত হয়েছিল।

কবি ক্ষেমানন্দের মতে — 'কিআ পাতে জন্ম হৈল কেতকা সুন্দরী' — অর্থাৎ মনসা দেবীর আরেক নাম কেতকা। এই জন্মবৃত্তান্ত অন্য কোনও কবির রচনায় পাওয়া যায় না। কবি নিজেকে কেতকাদাস অর্থাৎ মনসার দাস বা ভক্ত বলে পরিচয় দিয়েছেন।

∇ কাব্য বিশ্লেষণঃ

ক॥ কাব্যটি মূলত বেহুলা-লখীন্দরের কাহিনি ভাগ নিয়েই রচিত।

খ॥ কাব্যের দেব খণ্ডে হরিবংশ, ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ প্রভৃতি থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন।

গ॥ নৌকা যাত্রার পথের বর্ণনায় কবি রাঢ় বঙ্গের বর্ধমান ও পার্শ্ববর্তী গোবিন্দপুর, গঙ্গাপুর, নারিকেল ডাঙ্গা, পিড়তলী, ত্রিবেণী ইত্যাদি গ্রাম এবং নদনদীর নাম ব্যবহার করেছেন — যা কাব্যকে বাংলাদেশের জীবনের অচ্ছেদ্য কাহিনি পরিচয়ে তুলে ধরেছে।

ঘ॥ ক্ষেমানন্দের বর্ণনায় সরলতা ও সহৃদয়তা বিশেষ মাধুর্যের সঞ্চার করেছে। যেমন — যোগিনীর ছদ্মবেশে বেহুলা পিতৃগৃহে পৌঁছালে শিঙ্গা ধ্বনি শুনে ভিক্ষা দিতে এসে তার মায়ের মনে পড়েছে মেয়ের কথা —

'তোমা দেখিয়া শোকে কান্দে মোর প্রাণ।
মোর কন্যা এক ছিল তোমার সমান॥
না বলিয়া কোথা গেল মড়া লৈয়া কোলে।
যোগিনী জাগালে শোক বেহুলা বদলে॥'

ঙ॥ কেতকাদাসের পূর্ববঙ্গীয় মাঝিদের বিলাপের বর্ণনায় চণ্ডী মঙ্গালের কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যের অনুরণন শ্রুত হয়।

চ॥ তাঁর কাব্যে বেহুলার স্নিগ্ধ করুণ কোমলতা ও পাতিব্রতের দৃঢ়তা বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে।

ছ॥ চাঁদ সদাগর চরিত্রটিকে প্রথমে একটি সুদৃঢ় পৌরুষ হিসেবে গড়ে তুললেও শেষ রক্ষা করতে পারেননি। তাঁর চাঁদ-ও প্রথামাফিকভাবে মনসার কাছে নতি স্বীকার করেছে।

জ॥ ক্ষেমানন্দের কাব্যে কয়েকটি চরিত্রের নামে নতুনত্ব পাওয়া যায়। যেমন — বেহুলার মায়ের নাম চুহিলা।

ঝ॥ ক্ষেমানন্দের প্রতিভার তুলনায় বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন।

ঞ॥ কেদতাদাসের কাব্যটির সঙ্গে উত্তর বিহারে প্রচলিত কাহিনির সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

∇ দুই ক্ষেমানন্দের পরিচয়ঃ

ক্ষেমানন্দ ভণিতায় একটি ক্ষুদ্র আকারের কাব্য পাওয়া গিয়েছে — তাই প্রশ্ন জাগে দুই ক্ষেমানন্দের পরিচয় নিয়ে। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটি দেবনাগরী অক্ষরে অনুলিখিত এবং লিপিকার পুরুলিয়ার নিকটবর্তী ডিস্‌সিহা গ্রামের বাসিন্দা। এই গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়। তিনি এই কবিকে স্বতন্ত্র এবনগ আদি ক্ষেমানন্দ বলে দাবি করেছেন। গবেষকদের অনুমান এই ক্ষুদ্র কাব্যের রচয়িতা অর্বাচিন এবং ক্ষেমানন্দ নাম গ্রহণ করে কাব্যটি লিখে থাকবেন। আমাদের আলোচ্য কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ কেবল স্বতন্ত্র নয়, রাঢ়বঙ্গের অন্যতম প্রধান কবি।

রামায়ণ অনুবাদ ও কৃত্তিবাস ওঝা-র কৃতিত্ব মূল্যায়ণ

বাংলাদেশে তুর্কী আক্রমণের (১২০৩ খ্রিঃ) পর হিন্দু ব্রাহ্মণেরা অস্তিত্ব রক্ষার জন্য, উচ্চ আদর্শ অনুসরণ করতে দেবভাষার পরিবর্তে মানুষের তথা বাংলা ভাষায় ধর্ম ও শাস্ত্র গ্রন্থের অনুবাদ শুরু করে। অবশ্য লিখিত অনুবাদের পূর্বে কথকতার মাধ্যমে তার পূর্ব-সূচনা হয়েছিল। অনুবাদ হয় 'শ্রীমদ ভাগবত', 'রামায়ণ', 'মহাভারত' বিভিন্ন পুরাণ-উপপুরান, সংস্কৃত সাহিত্য-সাহিত্যতত্ত্ব ইত্যাদি। মহাকবি বাল্মীকির 'রামায়ণ' মহাকাব্যের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ বাংলা অনুবাদক কৃত্তিবাস ওঝা।

কৃত্তিবাস ওঝা-র ব্যক্তি পরিচয়ঃ হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি সংরক্ষিত পুথিতে প্রথম কৃত্তিবাস ওঝা-র ব্যক্তি পরিচয় পাওয়া যায়। কবির জন্মকাল — 'আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ (পূণ্য) মাঘ মাস। / তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস॥' (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য / দীনেশচন্দ্র সেন) । উধৃত তথ্যটিতে তিনটি বিষয় উহ্য — ক) কবির জন্ম সাল, খ) 'শ্রীরামপাঁচালী' কাব্যের রচনাকাল, গ) কাব্যটি অনুবাদের পৃষ্ঠপোষক কে ছিলেন। উদ্ধৃত আত্ম বিবরণীটি জ্যোতিষ শাস্ত্রে গণনা করে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি জানিয়েছেন — কবির জন্মকাল ১৪৩২ খ্রিস্টাব্দের ১১ ফেব্রুয়ারি (১৩৫৪ শকাব্দ)। নগেন্দ্রনাথ বসু সংরক্ষিত পুথিতে 'পূর্ণ' স্থলে পাঠান্তর রয়েছে 'পূণ্য' (আত্ম পরিচয়টির আবিষ্কারক নলিনীকান্ত ভট্টশালী)। নলিনীকান্ত ভট্টশালীর অনুরোধে যোগেশচন্দ্র 'পূণ্য' শব্দটিকে গুরুত্ব দিয়ে পুর্নগণনা করে জন্মসাল নির্নয় করেন ১৩৯৮ ।

সঠিক জন্মসাল নির্নয়ে পরোক্ষ সুত্র বিবেচ্য। কবি জানিয়েছেন যে বার বছর বয়সে 'উত্তরদেশে' পড়তে গিয়েছিলেন এবং সর্ব বিদ্যায় বিশারদ হয়ে ফিরে আসেন। কবিখ্যাতি লাভের আশায় পঞ্চশ্লোকে গৌড়েশ্বরকে সন্তুষ্ট করেন ও 'মহারাজা দিলা পুষ্পমালা' ও তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় অনুবাদ করেন। অর্থাৎ অনুবাদের সময় কবির বয়স কমপক্ষে পচিশ বছর। দ্বিতীয়ত — কুলজী গ্রন্থ ধ্রুবানন্দের 'মহাবংশাবলী' অনুসারে কবি ১৪৮০ সালের পূর্বে স্বর্গারোহণ করেছিলেন। তৃতীয়ত — কবি বার্ধক্য বয়সে প্রয়াত হন — অর্থাৎ তিনি প্রায় আশি বছর জীবিত ছিলেন। পরোক্ষ তথ্যের সাপেক্ষে সাহিত্য ঐতিহাসিকেরা সিদ্ধান্ত পৌঁছেছেন কবির জন্ম ১৩৯৮ সালে। কৃত্তিবাস ওঝা-র 'শ্রীরামপাঁচালী' কাব্যটি পঞ্চদশ শতকের তৃতীয় দশকে বা তারপরে অনূদিত। তবে অনুবাদের পৃষ্ঠপোষক রাজা সুলতান রুকনুদ্দিন বরবক শাহ (সুখময় মুখোপাধ্যায়) বা তাহেরপুরের জমিদার বা রাজা গণেশের পুত্র জালালুদ্দিন (ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ) — সেই বিতর্কের সমাধান হয়নি।

আত্ম বিবরণী থেকে জানা যায় কবির পূর্বপুরুষ ছিলেন নারসিংহ ওঝা। তিনি বেদানুজ রাজার পাত্র ছিলেন। একদা ওই অঞ্চল মুসলমান আক্রান্ত হলে তিনি গঙ্গার পূর্ববর্তী ফুলিয়া গ্রামে নতুন বসতি নির্মাণ করেন। কবির পিতার নাম বনমালী, মা মালিনী। কবির ছয় ভাই ও এক বোন ছিল।

শ্রীরামপাঁচালী-র বিশিষ্টতাঃ প্রথমত - 'শ্রীরামপাঁচালী' একটি প্রাঞ্জল ভাবানুবাদ কাব্য। বাল্মীকি-র কাব্যের গ্রহণ-বর্জন, নতুন কাহিনির সংযোজন করে অনুবাদক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত - 'শ্রীরামপাঁচালী'র ভক্তি প্রসঙ্গ কৃত্তিবাসের অবদান। এই ভক্তির অনুপ্রেরণা পুরান, অধ্যাত্ম রামায়ণ, যোগাবশিষ্ট রামায়ণ, বৈষ্ণব দাস্য ভক্তি ও শাক্ত ভক্তি। তৃতীয়ত — বাংলাদেশের শ্যাম্ল প্রকৃতিও কৃত্তিবাসের ভক্তি ব্যাকুলতায় আর্য রামায়ণের বিস্তৃতি, গতি ও ক্লাসিক মহিমা বাঙালিসুল্ভ হয়ে উঠেছে। চতুর্থত — কাব্যের আখ্যান ও চরিত্র বাঙালিয়ানায় অনুসৃজিত হয়েছে। কাব্যে বাংলাদেশের প্রকৃতি, জীবন-জীবিকা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। মহাকাব্যের প্রধান-অপ্রধান চরিত্রেরা প্রাত্যহিক জীবনে বাঙালি সৌভ্রাতৃত্বের পরিচয় দিয়েছে। কাব্যটির মুল সূত্র বাল্মীকির 'রামায়ণ' হয়েও কৃত্তিবাসের অনুবাদে বাঙালির জীবনকথা হয়ে উঠেছে। পঞ্চমত - কৃত্তিবাস ওঝা-র অনুসৃজনে 'শ্রীরামপাঁচালী'র প্রতিটি শ্লোক বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হয়ে উঠেছে। ষষ্ঠত - 'শ্রীরামপাঁচালী' কাব্যের ভাষা, ছন্দ, অলংকার কৃত্তিবাস ওঝা-র কবি কৃতিত্বের পরিচায়ক। কাব্যে ব্যবহৃত প্রবাদ-প্রবচন কবির সমাজবোধের পরিচায়ক।

'শ্রীরামপাঁচালী' বাঙালিয়ানার প্রভাবঃ মহাকবি কৃত্তিবাসের 'শ্রীরামপাঁচালী' বাঙালির জাতীয় সম্পদ। কবি, মূল কাহিনির আধারে বাঙালির জীবনরস পরিবেশন করেছেন। তাই মূল অনুবাদের পরিবর্তে বাঙালির নিজস্ব

সংস্কার-সংস্কৃতিই বেশি দেখা যায়। কাব্যটির আখ্যান, চরিত্র, পরিবেশ বর্ণনা, সমাজিকতা, নিসর্গ প্রকৃতি, দৈনন্দিন জীবনচর্চায় বাঙালিত্বের ও বাংলাদেশের নিবিড় স্পর্শ অনুভূত হয়। দ্বিতীয়ত - 'শ্রীরামপাঁচালী'তে দেখা যায় রামচন্দ্র বাঙালী বীরের শৌর্য, পত্নী প্রেমে দুর্বল, মমতা ও কোমলতায় সজল। সীতা বাঙালী গৃহবধূর মতো লজ্জাশীলা, সহিষ্ণু ও স্বামীর অনুগত। তৃতীয়ত — পারিবারিক জীবনে কবির আদর্শ বাংলাদেশের সমাজ। যেমন — বনবাসের যাওয়ার পূর্বে রামচন্দ্র বিমাতা কৈকেয়ীর চরণ বন্দনা করেছে। 'অরণ্যকাণ্ডে' বিদেহী দশরথের আত্মার শান্তি কামনায় সীতা বালির পিণ্ড দান করেছে। চতুর্থত — অনুবাদক বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানের নাম ব্যবহার করে অযোধ্যার রামকথাকে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। গঙ্গা-অবতরণ প্রসঙ্গে কবি নবদ্বীপ, নদীয়া, মেড়াতলা, সপ্তগ্রাম প্রভৃতির কথা বলেছেন। পঞ্চমত — খাদ্য ও পানীয় প্রসঙ্গে নারিকেল, কলা, আম, কাটাল, দুধ, দই, কইমাছ, চিতল মাছের কথা উল্লেখিত হয়েছে। খাদ্য পরিবেশিত হয়েছে বাঙালী রীতিতে। ষষ্ঠত — নিসর্গ ও পশুপাখির বর্ণনায় বাংলাদেশের শ্যামল প্রকৃতি চিত্রিত হয়েছে।

'শ্রীরামপাঁচালী' কাব্যের মূল্যায়ণে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন — 'মূল রামায়ণকে অবলম্বন করিয়া বাঙালির হাতে রামায়ণ স্বতন্ত্র মহাকাব্য হইয়া উঠিয়াছে। এই বাংলা মহাকাব্যে বাল্মীকির সময়ের সামাজিক আদর্শ রক্ষিত হয় নাই। ইহার মধ্যে প্রাচীন বাঙ্গালী সমাজই আপনাকে ব্যক্ত করিয়াছে।' কৃত্তিবাসের 'শ্রীরামপাঁচালী'তে পরিস্ফুট বাঙালিয়ানা সম্পর্কে এতাই সারকথা, শেষকথা।

বাংলা মঙ্গালকাব্যের ইতিহাসঃ ধর্মমঙ্গাল

◎ মঙ্গালকাব্যঃ

প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের বদ্ধমূল বিশ্বাস জন্মেছিল — তাদের সুদিন বা দুর্দিনের নেপথ্যে আছেন একজন দেবতা বা দেবী। মানুষের এই বিশ্বাসেই দেবতার পূজার প্রচলন এবং মাহাত্ম্য-গাথার সূচনা। কাল্‌ক্রমে কবিরা সেই সমাজপ্রসূত কাহিনিকে কাব্যরূপ দিয়েছেন — এই কাব্যগুলিই 'মঙ্গালকাব্য'। প্রসঙ্গাত আর্যিরা যেখানেই সুন্দর বা শক্তিকে দেখেছিল, তাকেই দেবতার আসন দিয়েছিল। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের কথায় — 'খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ভারতচন্দ্রের কাল পর্যন্ত বঙ্গাসাহিত্যে যে বিশেষ এক শ্রেণীর ধর্ম বিষয়ক আখ্যানকাব্য প্রচলিত ছিল তাহাই বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে মঙ্গালকাব্য নামে পরিচিত।' (বাংলা মঙ্গালকাব্যের ইতিহাস)

◎ মঙ্গালকাব্যের সাধারণ লক্ষণঃ

মঙ্গালকাব্যগুলির তুলনামূলক আলোচনায় প্রাপ্ত সাধারণ লক্ষণগুলি হল —

১ ॥ বন্দনা, গ্রন্থ-উৎপত্তির কারণ, দেবখণ্ড ও নরখণ্ডে কাহিনির বিন্যাস।

২ ॥ বিষয় হিসাবে থাকবে চৌতিসা, বারমাস্যা, ফল-ফুল-বিহঙ্গোর তালিকা, ভোজ্য দ্রব্যের তালিকা, বিবাহের বিশদ বর্ণনা, যুদ্ধের বর্ণনা ইত্যাদি।

৩ ॥ দেবতারা স্বর্গলোক থেকে কাউকে শাপভ্রষ্ট করে পাঠাবেন মর্ত্যভূমিতে। অতঃপর নানা প্রতিকূলতা জয় করে উক্ত দেবতা বা দেবীর পূজা প্রচার করে আবার স্বর্গলোকে ফিরে যাবেন।

৪ ॥ সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা, পৌরাণিক দেব-দেবীর বর্ণনা, দিগবন্দনা, নারীগণের পতিনিন্দা ইত্যাদি বিষয়েও মঙ্গালকাব্যের আবশ্যিক উপাদান বলে গণ্য।

◎ অঞ্চলভেদে মনসা মঙ্গালকাব্যের শ্রেণিবিভাগ ও উল্লেখযোগ্য কবিঃ

ড. সুকুমার সেন বাংলাদেশে প্রচলিত মঙ্গালকাব্যগুলিকে অঞ্চলভেদে চারটি ভাগে বিভক্ত করেছেন —

ক ॥ পূর্ববঙ্গোর ধারাঃ বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব প্রমুখ কবি।

খ ॥ রাঢ় বঙ্গোর ধারাঃ বিপ্রদাস পিপলাই, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ প্রমুখ কবি।

গ ॥ উত্তরবঙ্গোর ধারাঃ জগজ্জীবন ঘোষাল, তন্ত্রবিভূতি প্রমুখ কবি।

ঘ ॥ বিহারের ধারাঃ লোককথায় বিচ্ছিন্নভাবে প্রচলিত কাহিনি।

বাংলা মঙ্গালকাব্যের ইতিহাসঃ ধর্মমঙ্গাল

মূলত রাঢ়বঙ্গোর ধারা 'ধর্মমঙ্গাল' কাব্য। 'ধর্মমঙ্গাল' কাব্যের দুটি কাহিনি পাওয়া যায় — হরিশচন্দ্র-রোহিতাশ্ব এবং লাউসেন। এই দ্বিতীয় কাহিনিটিই জনপ্রিয় তথা মূল কাহিনি।

☒ লাউসেন কাহিনিঃ

গৌড়েশ্বরের সামন্ত রাজা কর্ণসেন ঢেকুরগড়ের রাজত্ব করতেন। তার তত্ত্বাবধানে সোম ঘোষের পুত্র ইছাই ঘোষের সঙ্গো যুদ্ধে পরাজিত হন, তৎসহ তার ছয় পুত্র মারা যায় এবং সেই শোকে স্ত্রী-ও দেহত্যাগ করেন। গৌড়েশ্বর কর্ণসেনের প্রতি সহানুভূতিবশত তার সঙ্গো আপন শ্যালিকা রঞ্জাবতীর বিয়ে দেন — এই বিয়েতে শ্যালক মহামদের আপত্তি ছিল। বিবাহের দীর্ঘ দিন পর ধর্ম ঠাকুরের আর্শিবাদে লাউসেনের জন্ম হয়।

মহামদ ক্ষোভে শত্রুতা শুরু করে — এমনকি লাউসেনের সঙ্গোও চক্রান্ত শুরু করে। সে লাউসেনকে অপহরণ, বন্দী করা, বিপদসঙ্কুল পথে কামরূপে রাজস্ব আদায় করতে পাঠানো, সিমুলার রাজা হরিপালের কন্যা কানাড়াকে বিয়ে নিয়ে চক্রান্ত করে এবং শেষ পর্যন্ত নিজেই অজুহাত দেখিয়ে যুদ্ধ শুরু করে ও পরাজিত হয়েছে। এরপর মহামদ কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয় এবং লাউসেনের চেষ্টায় ও দেবতা ধর্মের কৃপায় মুক্তি পায়। পরবর্তিতে রঞ্জাবতী ও লাউসেন স্বর্গে ফিরে যায়। ধর্মের পূজার জন্য আদিত্য রামাই পণ্ডিতরূপে জন্মগ্রহণ করেন। সদাডোম ও

হরিশচন্দ্রের পালায় ওই রামাই পন্ডিতের কাহিনি বিবৃত হয়েছে। প্রসঙ্গাত হরিশচন্দ্রের পালাটি সব থেকে প্রাচীন (ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য)।

☐ ধর্মমঙ্গাল কাব্যের কবিঃ

সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতারা প্রায় কুড়ি জন 'ধর্মমঙ্গাল' কাব্যকারের সন্ধান পেয়েছেন। এই ধারার আদি কবি ময়ূর ভট্ট এবং অপর বিখ্যাত কবিরা হলেন — রূপরাম চক্রবর্তী, ঘনরাম চক্রবর্তী, রামদাস আদক, সীতারাম দাস, যদুনাথ রায়, খেলারাম, শ্যামপণ্ডিত, মাণিকরাম গাঙ্গুলি, সহদেব চক্রবর্তী প্রমুখ।

☐ শ্রেষ্ঠ কবির পরিচয়ঃ

'ধর্মমঙ্গাল' কাব্যের কবিদের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় ঘনরাম চক্রবর্তী। তাঁর কাব্যটি প্রথম মুদ্রিত হয়েছিল এবং উৎকর্ষেও সর্বাগ্রগণ্য।

কবি ঘনরামের 'শ্রীধর্মমঙ্গাল' কাব্যটি ১৭১১ সালে লেখা সম্পূর্ণ হয়েছিল। সমকালীন অন্যান্য মঙ্গাল কাব্যের মতো কবি কাব্য রচনায় স্বপ্নাদেশের কথা বলেননি। ঘনরামের কাব্যের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ —

১॥ ঘনরামের কাব্যে স্বভাবকবিত্বের সঙ্গো পাণ্ডিত্যের সংযোগ বিশেষভাবে লক্ষিত হয়।

২॥ কবির শব্দচয়ন অত্যন্ত মার্জিত এবং উন্নত রুচির পরিচায়ক। যেমন —

ক) 'করপুটে এ' সঙ্কটে কাতরে কিঙ্কর রটে
উর ঘটে পুর অভিলাষ ।'

খ) 'চকোর চকোরী নাচে চাহিয়া চপলা।
মনে হৈল নিকটে আইল মেঘমালা॥'

৩॥ কবি সমাজ বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তাঁর গভীর সমাজবোধ কাব্যমধ্যে বিধৃত আছে। যেমন — 'রোগ ঋণ-রিপু-শেষ দুঃখ দেয় র'য়ে / হাতে শঙ্খ দেখিতে দর্পণ নাই খুঁজি॥' ইত্যাদি।

৪॥ ঘনরাম অসংখ্য উদ্ভট শ্লোক সুন্দর ও সহজ বাংলায় অনুবাদ করে তাঁর কাব্যে যুক্ত করেছেন। যেমন —

ক) 'মৃত দেহ দাহ করে চিতার অনল।
সজীব শরীর সদা দহে চিন্তানল॥'
- মূল রূপ ছিল 'চিন্তাচিন্তাদ্বয়োর্মধ্যে..'

খ) 'কুপুত্র হইলে কুলে কুলাঙ্গার কহে।
কুবৃক্ষ কোটরে অগ্নি উঠে বন দহে॥'
- মূল রূপটি ছিল — 'একেনাপি কুবৃক্ষেণ ....)

৫॥ সমকালীন সমাজ থেকে বহু প্রবাদ-প্রবচন অন্তর্ভুক্ত করেছেন — আবার তাঁর কথায় প্রবাদে পরিণত হয়েছে।

৬॥ অসংখ্য পৌরাণিক কাহিনির প্রসঙ্গা যুক্ত করেছেন।

৭॥ চরিত্র সৃষ্টিতে মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের কথায় — 'লাউসেন ধর্মমঙ্গাল কাব্যের আদর্শ সৃষ্টি, কিন্তু কর্পূরই একমাত্র বাস্তব সৃষ্টি। ঘনরামের সামাজিক চরিত্র সৃষ্টির প্রয়াস কর্পূরের চরিত্রসৃষ্টিতে সুসঙ্গাত সৌন্দর্যে মণ্ডিত হইয়াছে।'

৮॥ মাত্রাবৃত্ত ছন্দের পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিশেষভাবে দেখা যায়।

৯॥ 'শ্রীধর্মমঙ্গাল' কাব্যটি ২৪টি পালা সমন্বিত — যা মঙ্গালকাব্যের রীতি অনুসারী।

১০॥ ঘনরামের কবিত্বের দ্বারা ভীষণ প্রভাবিত এবং সমৃদ্ধ হয়েছেন রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়।

'ধর্মমঙ্গাল' কাব্যধারায় ঘনরামের কৃতিত্বের সারস্বত মূল্যায়ণ করে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের লিখেছেন — 'চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যের ঐশ্বর্য-যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি যেমন ভারতচন্দ্র, ঘনরামও তেমনি ধর্মমঙ্গাল কাব্যের ঐশ্বর্য যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি।'

☐ 'ধর্মমঙ্গাল' কাব্য 'রাঢ়ের জাতীয় মহাকাব্য'

আলোচ্য 'ধর্মমঙ্গাল' কাব্যধারার আলোচনায় রাঢ় অঞ্চলের মানুষের জীবনের সামগ্রিক পরিচয়কে লক্ষ্য করে সমালোচক বলেছেন যে, ধর্মমঙ্গাল কাব্য রাঢ়ের জাতীয় মহাকাব্য। সাহিত্যের সংরূপ পদবাচ্যে 'জাতীয় মহাকাব্য' বিষয়টি আলোচনা সাপেক্ষ —

ক) ধর্মমঙ্গালের কাহিনি ইতিহাস প্রসিদ্ধ বীরত্বের আখ্যান। তৎসহ কাব্যটিতে সেই সময়ের রাজনৈতিক এবং সামাজিক ইতিহাসের পরিচয়ও পাওয়া যায়।

খ) কাহিনি 'বীর' রসাত্মক।

গ) কাব্যের নায়ক উচ্চ বংশজাত।

ঘ) আখ্যান স্বর্গ-মর্ত্য বিস্তৃত।

ঙ) অসংখ্য চরিত্র বিদ্যমান।

চ) মহাকাব্যের মতো গভীরতা এই কাব্যে নেই।

ছ) কাব্যটির ভাষা ছন্দ অলংকার অনেক নিম্নশ্রেণির।

জ) কাব্যের কাহিনি প্রাচীন নয়।

ঝ) জাতীয় জীবন নয় — একটি আঞ্চলিক সীমানায় জাতির জীবনের আখ্যান।

এবংবিধ আলোচনায় আমরা বলতে পারি প্রকৃত পরিচয়ে 'জাতীয় মহাকাব্য' হয়নি তবে সীমিত অঞ্চলের বা রাঢ়ের জাতীয় জীবনের কাব্য হয়ে উঠেছে।

প্রশ্নঃ 'ধর্মমঙ্গাল' কাব্যধারার পরিচয় দিয়ে শ্রেষ্ঠ কবির কৃতিত্ব মূল্যায়ণ কর । 'ধর্মমঙ্গাল'কে 'রাঢ়ের জাতীয় মহাকাব্য' বলার যৌক্তিকতা বুঝিয়ে দাও । / ধর্মঠাকুরের স্বরূপ বিশ্লেষণ করো । ধর্মমঙ্গাল কাব্যধারার উল্লেখযোগ্য দুজন কবির নাম লেখো । এই কাব্যধারার শ্রেষ্ঠ কবির কবিকৃতির আলোচনা করো । (২০১৫)

শাক্ত পদাবলীঃ সাধারণ পরিচয়

তন্ত্রের উপাস্য দেবী কালীকাকে কন্যা রূপে ও জগৎ জননী রূপে বন্দনা করে রচিত পদ বা গানকে 'শাক্ত পদাবলী' (পূর্ব নাম 'মালসী') বলা হয়। দেবীর কন্যা রূপ নিয়ে রচিত পদাবলী দুই পর্যায়ের — আগমনী ও বিজয়া। দেবীর জগৎ জননী রূপ নিয়ে রচিত পদাবলী 'ভক্তের আকুতি' পর্যায়।

আগমনীঃ কন্যা উমার সংসার জীবন, পিতৃগৃহে তিন দিনের জন্য আসা, মা-মেয়ের মান-অভিমান, মেয়েকে বিদায় জানাতে হবে এই কল্পনায় মায়ের বেদনা, কন্যার প্রতি স্নেহ ইত্যাদি নিয়ে লেখা গান। এই আখ্যানের প্রধান চরিত্র উমা, মা মেনকা, পিতা গিরিরাজ হিমালয়।

বিজয়াঃ আগমনীর অনিবার্য এবং সম্ভাব্য পরিণতি বিজয়া। এই পর্যায়ে উমা পিতৃ গৃহ থেকে বিদায় নিয়ে পতি গৃহে ফিরে যাওয়ার মর্মন্তুদ কাহিনি।

ভক্তের আকুতিঃ ভক্তের আন্তরিক আকাঙ্খার দ্যোতক 'ভক্তের আকুতি'। দৈনন্দিন জীবনের গ্লানি থেকে মুক্তি পাওয়ার বাসনায় ভক্ত জগৎ জননীর স্নেহাঞ্চল বা আশির্বাদ কামনা করেন। এই আকুতি বা প্রার্থনা নিয়ে লেখা হয়েছে 'ভক্তের আকুতি'।

বাংলা সাহিত্যে 'শাক্ত পদাবলী'র সূচনা আঠারো শতকে। এই ধারার প্রথম ও শ্রেষ্ঠ কবি রামপ্রসাদ সেন। আঠারো-উনিশ শতকে বাংলাদেশে অন্তত কুড়ি জন কবির সন্ধান পাওয়া যায়। মধ্য যুগের শেষ শতকের এই সাহিত্য ধারা আধুনিক যুগেও প্রসারিত এবং দেবীও পূজিত হচ্ছেন।

কবি পরিচয়ঃ 'শাক্ত পদাবলী'কে বাংলা সাহিত্যের প্রধান শাখায় পৌঁছে দিয়েছেন কবি রামপ্রসাদ সেন এবং কমলাকান্ত ভট্টাচার্য। এই ধারার পরবর্তী কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য — গোবিন্দ চৌধুরী, নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, রামলাল দাসদত্ত, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, মহারাজ নন্দকুমার প্রমুখ। কবিওয়ালাদের মধ্যে হরু ঠাকুর, এন্টনী ফিরিঙ্গি, রাম বসু 'শাক্ত পদাবলী' লিখেছেন। যাত্রাওয়ালাদের মধ্যে মদন মস্টার ; নাটককারদের মধ্যে মনোমোহন বসু, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (মহারাজ), গিরিশচন্দ্র ঘোষ ; আধুনিক কবিদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মধুসূদন দত্ত, নবীনচন্দ্র সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন প্রমুখ 'শাক্ত পদাবলী' লিখেছেন।

শাক্ত পদাবলীঃ কবি রামপ্রসাদ সেন

'বসন পর, বসন পর, মাগো, বসন পর তুমি' — দেবীকে জননী স্থান দিয়ে এই আকুতি ভরা আবেদনে আপামর বাঙালির কাছে শাক্ত দেবী কালীকে পরিচিত করালেন এবং বরাভয়ের দেবী রূপে নির্মাণ করলেন কবি রামপ্রসাদ সেন। কথিত আছে দেবী কন্যা ও জননী রূপে রামপ্রসাদের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন। কবি রামপ্রসাদ সেন 'আগমনী বিজয়া' এবং 'ভক্তের আকুতি' — দুই পর্যায়ের গানই লিখেছেন।

ব্যক্তি জীবনঃ কবি রামপ্রসাদ সেনের জন্ম ১৭২০ সালে (ড. দীনেশ চন্দ্র ভট্টার্চায)। পিতার মৃত্যুর পর সাংসারিক দায়িত্ব পালনের উদ্দেশে মুহূরির কাজে যোগ দেন। একবার হিসেবের খাতায় সাধক কবি একটি গান লেখেন — 'আমায় দাও মা তবিলদারী'। এই গানটি জমিদারের নজরে এলে কবির আসল পরিচয় পেয়ে তিনি কবিকে কাজ থেকে মুক্ত করেন এবং মাসিক ত্রিশ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। কবির সাধনায় ও গানে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় চৌদ্দ বিঘা নিষ্কর ভূমি দান করেছিলেন।

সাহিত্য সাধনাঃ কবি রামপ্রসাদ সেনের কবিতাগুলি বিষয় অনুসারে — ক) উমা বিষয়ক (আগমনী ও বিজয়া), খ) সাধন বিষয়ক (তন্ত্র সাধনা), দেবীর স্বরূপ, তত্ত্ব দর্শন ও নীতি বিষয়ক, গ) ব্যক্তিগত অনুভূতি বিষয়ক।

উমা বিষয়ক গানগুলি আসলে 'আগমনী ও বিজয়া' পর্যায়ের গান। এই পর্যায়ে কবি উমা বা গৌরী ও মেনকার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ, মা-মেয়ের মর্মন্তুদ বিচ্ছেদ বেদনার ছবি তুলে ধরেছেন। যেমন —

ক) 'ওগো রাণি, নগরে কোলাহল, উঠ, চল চল,
নন্দিনী নিকটে তোমার গো। ...'

খ) 'গিরি এবার আমার উমা এলে আর উমা পাঠাব না ...'

গ) ‘ওহে প্রাণনাথ গিরিবর হে, ভয়ে তনু কাঁপিছে আমার …’

ঘ) ‘বাছার নাই সে বরণ, নাই আভরণ / হেমাঙ্গী হইয়েছে কালীর বরণ …’

‘ভক্তের আকুতি’ পর্যায়ে কবি রামপ্রসাদ সেন আদ্যাশক্তির লীলামাহাত্ম্য দর্শন করেছেন। তৎসহ তিনি জীবন, নীতি ও ধর্ম সাধনার অনুভবে পদ লিখেছেন। যেমন —

ক) ‘মায়ের মূর্তি গড়তে চাই, মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে। / মা বেটি কি মাটির মেয়ে, মিছে খাটি মাটি নিয়ে …’

খ) ‘কালী হলি মা রাসবিহারী / নটবর বেশে বৃন্দাবনে’।

গ) ‘আমায় দেও মা তবিলদারী / আমি নিমক হারাম নই শঙ্করী’

ঘ) ‘মা আমায় ঘুরাবে কত / কলুর চোখ ঢাকা বলদের মতো’

ঙ) এমন দিন কি হবে তারা / যবে তারা তারা বলে তারা বেয়ে পড়বে ধারা’ ইত্যাদি।

কবি রামপ্রসাদ সেনের গানে সমকালীন সমাজের সুখ, দুঃখ, নিপীড়ন, দারিদ্র্য সবই ফুটে উঠেছে। কবি ভক্তি-ভাবুকতায় ও আধ্যাত্মিকতায় যেন ধূলির আসনে বসে ধ্যান নেত্রে ভূমাকে প্রত্যক্ষ করেছেন।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

আবিষ্কারঃ বাংলা সাহিত্যের আদি-মধ্য যুগের প্রাচীনতম নিদর্শন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য। কাব্যগ্রন্থটি আবিষ্কারক বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়। তিনি, বর্ধমান জেলার কাকিল্যা গ্রামের দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির গোয়াল ঘরের মাচা থেকে ১৩১৬ বঙ্গাব্দ (১৯০৯ সাল)-এ আবিষ্কার করেছিলেন ।

প্রকাশঃ বসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় ১৩২৩ বঙ্গাব্দ (১৯১৬ সাল)-এ 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' থেকে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামে প্রকাশিত হয়েছিল।

গ্রন্থের নামকরণঃ গ্রন্থটির কবি প্রদত্ত নাম পাওয়া যায় না। সম্পাদক, লোক ঐতিহ্য এবং কাব্যের বিষয়বস্তুকে গুরুত্ব দিয়ে নামকরণ করেছিলেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' ।

কাব্যটিতে একটি পুষ্পিকা বা চিরকূট পাওয়া গিয়েছিল। ওই চিরকূটে 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ব্ব' নামটি পাওয়া যায় — একেই অনেকে গ্রন্থের প্রকৃত নাম বলেছেন। তবে, ওই চিরকুটটি ১০৮৯ বঙ্গাব্দ (১৬৮২ সাল)-এ লেখা এবং জীব গোস্বামীর 'ষট্‌সন্দর্ভে'র অন্যতম সন্দর্ভ 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' — তাই এই নামটি গ্রহণ করা যায় না। সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়ার পূর্বে সম্পাদকের প্রদত্ত নামটি গণ্য করাই সমীচীন।

রচনাকালঃ ভাষাবিদদের মতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র লিপি এবং ভাষা ১৪০০ বা ১৪৫০ শতকের কাছাকাছি।

দুই — 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে কোথাও চৈতন্য বা বৈষ্ণবের বন্দনা নেই।

তিন — চৈতন্য পরবর্তি রাধা-কৃষ্ণ প্রেমগান কামগন্ধহীন পরকীয়া প্রেমের চর্চা এবং এই কৃষ্ণের মধ্যে মার্ধুয সত্তার প্রকাশ ঘটেছে — আলোচ্য কাব্যে আসঙ্গালিপ্সার প্রাধান্য দেখা যায় এবং কৃষ্ণের চরিত্রে ঐশ্বর্য্য সত্তা প্রকট।

উপরোক্ত প্রমাণের ভিত্তিতে বলা যায় - 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যটি পঞ্চদশ শতকে লেখা হয়েছিল।

বিষয়বস্তুঃ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' আখ্যানধর্মী কাব্য। কবি, কাব্যের কাহিনিকে ১৩টি খণ্ডে বিন্যস্ত করেছেন। খণ্ডগুলি যথাক্রমে — জন্ম খণ্ড, তাম্বুল খণ্ড, দান খণ্ড, নৌকা খণ্ড, ভার খণ্ড, ছত্র খণ্ড, বৃন্দাবন খণ্ড, কালীয়দমন খণ্ড, যমুনা খণ্ড, হার খণ্ড, বাণ খণ্ড, বংশী খণ্ড এবং অথঃরাধাবিরহ।

কাব্যের কাহিনি সংক্ষেপে এইরূপ — পৃথিবীকে কংসের অত্যাচার থেকে মুক্ত করার উদ্দেশে বাসুদেব-দৈবকী'র পুত্র রূপে কৃষ্ণ এবং সাগর-পদুমার কন্যা রূপে রাধা জন্ম নেয়। অতঃপর দু'জনের পরিচয় ও প্রেমের সম্পর্ক এবং মিলনের পর মহোত্তম কর্মসাধনের উদ্দেশে রাধাকে ত্যাগ করে কৃষ্ণ ম্থুরা চলে যায়। উল্লেখ্য কাব্যটির আদিতে, মধ্যের এবং শেষের কিছু পাতা পাওয়া যায়নি। এভাবে শেষ খণ্ডের নামের সঙ্গে 'খণ্ড' যুক্ত ছিল কি-না তা জানা যায় না।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের কাহিনি খণ্ডবিন্যাসে নিম্নরূপ —

জন্মখণ্ড — পৃথিবীকে কংসের অত্যাচার থেকে মুক্ত করার জন্য বিষ্ণু কৃষ্ণ রূপে ও লক্ষ্মী রাধা রূপে জন্মগ্রহণ করে। কংস, আকাশবাণীতে নিজের ভবিষ্যৎ শুনে কৃষ্ণকে বধ করার জন্য পূতনা, কেশী, যমলার্জুনকে পাঠায় — কিন্তু সকলকেই কৃষ্ণ বধ করে। এই জন্মে কৃষ্ণ পূর্ব জন্মের পরিচয় স্মরণ করতে পারলেও রাধা বিস্মৃত হয়। আইহনের সঙ্গে রাধার বিয়ে হয়। গোয়ালাবৃত্তির জন্য রাধার রক্ষণে বড়াই-কে নিয়োগ করে।

তাম্বুল খণ্ড -

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের বিশিষ্টতা বা সাহিত্যমূল্যঃ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যটি রচনায় কবিতার সঙ্গে উক্তি-প্রত্যুক্তির সাহায্য নিয়েছেন কবি। অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের উপভোগ্য বিষয় কাব্যরস ও নাট্যরস।

দ্বিতীয়ত॥ সমকালের দাবীতে আসরে গানের উদ্দেশে কাব্যটির উপস্থাপন মাধ্যম করা হয়েছে 'অক্ষরবৃত্ত' ছন্দ রীতির 'পয়ার' ও 'ত্রিপদী' ছন্দবন্ধ।

তৃতীয়ত॥ কাব্যের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিতে কবি 'অলংকার' ব্যবহার করেছিলেন। যেমন —

ক) 'ওষ্ঠ আধর যেহ্ন যমজ পোঁয়ার'

খ) 'পাখি নহোঁ তার ঠাই উড়ী পড়ি জাঁও'

চতুর্থত॥ কবি বড়ু চণ্ডীদাস 'প্রবাদ প্রবচন' ব্যবহার করে জীবন অভিজ্ঞতা ও রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। যেমন —

ক) 'ললাট লিখিত খণ্ডন না জাএ'

খ) 'কাটল ঘাঅত লেম্বুরস দেহ কত'

গ) 'পরধন দেখিলে কি পাএ ভিখারী'

পঞ্চমত ॥ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র গ্রহণযোগ্যতা মানবিক আবেদনে। মূল কাহিনি শ্রীকৃষ্ণের লীলা হলেও কাব্যটির আশ্রয় যে প্রেম তা জাগতিক। নাবালিকা রাধার মধ্যে ভীরুতা, লজ্জা, প্রবল প্রতিবাদ ও আত্মরক্ষার চেষ্টা এবং তার মধ্যে প্রথম মিলনের শিহরণ ও পুলক কবি চমৎকার রূপে ফুটিয়ে তুলেছেন — বড়ু চণ্ডীদাসের কবিত্ব এখানেই অনন্য।

ষষ্ঠত ॥ কাব্য আস্বাদনে তথা পাঠে গীতিধর্মিতার শর্ত মেনে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' লেখা হয়েছিল। যেমন —

'কেনা বাঁশি বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে।
কে না বাঁশি বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকূলে।।
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদে মো আউলাইলো রান্ধন।।

সপ্তমত ॥ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের নাট্যলক্ষণ কাব্যটির রসাস্বাদন বাড়িয়ে দিয়েছে।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের সমাজচিত্রঃ পঞ্চদশ শতকে লেখা 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যটি সমকালীন সমাজ পরিচয়ের একটি সাক্ষর বা সমাজ-ইতিহাস। ওই সামাজিক পরিচয় নিম্নরূপ —

ক) রাষ্ট্রব্যবস্থা — দেশে একজন রাজা ছিল এবং শুল্ক আদায়ের বুবস্থা ছিল। তবে কাব্যটিতে মূলত গোপ বা গোয়ালা সমাজের কথা চিত্রিত হয়েছে।

খ) জীবিকা — সেকালে জীবিকা অনুসারে সামাজিক পরিচয় নির্ধারিত হত। এইরূপ কয়েকটি জীবিকা হল — গোপ, তেলী, নাপিত, কুমোর, বৈদ্য, বেদে, যাদুকর, মাঝি, বেনে, চণ্ডাল, স্বর্ণকার, যোগী, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র, মজুর, আর্চায় প্রভৃতি।

গ) বেশভূষা বা পোশাক পরিচ্ছদ — গোপ মেয়েরা শাড়ি, কাঁচুলি পরত। গোপ বধূরা বিভিন্ন ধরণের অলংকার (নূপুর, পাসলী, কিঙ্কিণী, ফুলের সজ্জা, কাজল) ব্যবহার করত। বিবাহিত মেয়েরা সিঁদুর-লোহা পরত। পুরুষেরা কাজল-চন্দন পরত।

ঘ) খাদ্য সামগ্রী — ভাত, শাক, অম্বল, ভাজা, দুধ-দই-ঘোল, সুপারি, পান, কর্পূর, চিনি ইত্যাদি সামগ্রীর প্রচলন ছিল।

ঙ) সামাজিক সংস্কার বিশ্বাস — মধ্যযুগীয় এই সমাজে নানা সংস্কার-কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। শুভ তিথি, শুভ লক্ষণ, শুভ বার — এগুলির ওপর মানুষের বিশ্বাস ছিল। তেমনি অনেক অশুভ (হাঁচি, টিকটিকি, কাকের ডাক, শূণয় কলসি, শেয়ালী দেখা, ভিখারি দেখা, শকুন দেখা) কল্পনাও ছিল।

চ) ধর্মকর্ম — সমাজে বিশেষ ধর্মকর্মের আড়ম্বরের পরিচয় পাওয়া যায়নি। ব্যতিক্রম চণ্ডীর পূজা - তবে বিভিন্ন দেবতা ও রামচন্দ্রের প্রসঙ্গ জানা জায়।

ছ) আসবাব — দুধ বা ভাত রাখার পাত্র, তেল বহনের পাত্র, উনুন, তরকারি কাটার অস্ত্র, ভাতনাড়ার কাঠি, কৃপাণ, ত্রিশূল, কামান, বাণ, শর, ধনু ইত্যাদি ব্যবহারের প্রচলন ছিল।

জ) স্বর্গ-মর্ত্য-পাপ-পুণ্যের বিশ্বাস — সেকালের লোকের বিশ্বাস ছিল পুণ্য কর্ম করলে স্বর্গে যায়, পাপ করলে নরকে যায়। মানুষ ভাগ্যে বিশ্বাস করত। স্ত্রী হত্যাকে ঘৃণা করত এবং মহাপাপ বলে গণ্য করত।

ঝ) সামাজিক বিধিনিষেধ — গাম্য জীবনে গোষ্ঠীগত সমাজপ্রথা ছিল। মেয়েদের স্বাধীনতা ছিল না। সমাজের বিধান অম্যাণ্য করলে একঘরে করে দেওয়া হত। কনিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠের কথা অমান্য করবে না এবং কেউ আশ্রিত বধ করবে না ইত্যাদি।

ঞ) আমোদপ্রমোদ খেলাধূলা — কাঠ বা কাপড়ের তৈরী বল বা গেণ্ডু, চাঁচড়ী, খেড়ী খেলার প্রচলন ছিল। বিনোদনে পান-কর্পূর সেবন, বাঁশি বাজানোর প্রচলন ছিল।

জ) পশুপাখি — কাব্যটিতে অনেক পশু, পাখির উল্লেখ আছে। যেমন — গরু, বাঁদর, উট, হরিণ, ভেক, শিয়াল, ময়ূর, কাক, ছাগল, সাপ, শকুন ইত্যাদি।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

ঐতিহাসিক গুরুত্বঃ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের আবিষ্কার বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। চর্যাগীতি রচনাকালে বাংলা ভাষা সম্পূর্ণরূপে অপভ্রংশের খোলস থেকে মুক্ত হয়নি। অতঃপর তুর্কি আক্রমণ এবং দেড়শো বছর পর পুনরায় সাহিত্য সৃষ্টির সূচনা — প্রথম রচনা বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য। বলাযায় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যটি প্রাচীন ও মধ্য যুগের মধ্যে যোগসূত্র তৈরি করেছে।

দুই॥ বাঙালির হাতে বাংলা ভাষায় রাধা-কৃষ্ণকে নিয়ে লেখা প্রথম কাব্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। পরবর্তিকালে রাধা-কৃষ্ণকে নিয়ে গড়ে ওঠে 'বৈষ্ণব পদাবলী'। এই অনুসৃজনে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যটির ভূমিকা অপরিসীম।

তিন॥ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে পৌরাণিক কাহিনি অপেক্ষা লৌকিক কাহিনিকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এখানে মানব-মানবীর জাগতিক তৃষ্ণাই প্রধান উপজীব্য বিষয়।

চার॥ কাব্যটি আদি-মধ্য যুগে রচিত হওয়ায় ভাষাতাত্ত্বিক বিচারের প্রামাণ্য গ্রন্থ হয়ে উঠেছে।

পাঁচ॥ এই গ্রন্থেই বিদেশি (আরবি-ফারসি) শব্দের ব্যবহার (মজুরি, মজুরিঅ) ঘটেছে।

ছয়॥ মধ্য যুগের সাহিত্যাদিতে গোষ্ঠী রচনার স্থলে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' একক ব্যক্তির রচনা। এতে কবির প্রতিভা শক্তি প্রশঙসনীয়।

সবশেষে বলা যায় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'ই প্রথম ঐশ্বর্য রসের সঙ্গে কিঞ্চিত মার্ধুয রসের প্রকাশ। পরবর্তী কালে এই মার্ধুয রসই বৈষ্ণব সাহিত্যের আঁধার হয়ে ওঠে। এসব কারণে কাব্যটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অবিসংবাদিত।

ষোড়শ শতক বাংলা সাহিত্যের ঐশ্বর্য যুগ

বাঙালির দীর্ঘকালীন (১২০০-১৩৫০) সুপ্তভঙ্গ এবং নবচেতনা সঞ্চারের কাল হিসাবে ষোড়শ শতককে অভিহিত করা চলে। সুলতান হুসেন শাহের রাজত্বকালে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে স্বাভাবিক জীবন ফিরে আসে — এই সময়েই প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হলেন। তাঁর আবির্ভাব দেশ-কাল অতিক্রম করে চৈতন্যের প্রভাব বাঙালির সমাজ ও সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছিল। এই ষোড়শ শতকেই চৈতন্যদেব মানবিক সম্পর্কের নবমূল্যায়ণ এবং নতুন আদর্শ প্রবর্তন করলেন। আমাদের আলোচ্য বিষয় বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই নবীন ভাবাদর্শ কী কী পরিবর্তন এনেছিল — যাকে 'ঐশ্বর্য যুগ' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

বৈষ্ণব পদাবলীঃ

রাধা-কৃষ্ণের রাগাত্মিকা প্রেমই বৈষ্ণবের আরাধ্য। চৈতন্যদেব যেদিকেই তাকাতেন সর্বত্রই কৃষ্ণকে দেখতে পেতেন। তাঁর এই অনুভবে এবং ভক্তপ্রাণ হৃদয়ের উদ্‌গত প্রচারে সমকালীন সমাজে সংস্কৃতি ও সাহিত্যে এক প্রেমের উন্মাদনা শুরু হয়েছিল। যার আশু পরিণতি 'বৈষ্ণব পদাবলী' এবং সমাজের জাতি-ধর্ম-বর্ণের ঊর্দ্ধে মানব-প্রেমের বাতাবরণ গড়ে উঠেছিল। সমাজে দৈব পরিচয়ের কৃষ্ণ হয়ে ওঠেন সখা এবং ভক্ত থেকে সাধারণের জীবনে এক নতুন পরিচয়ে পরমপুরুষ কৃষ্ণ সম্পর্কিত হন। 'বৈষ্ণব পদাবলী' সাহিত্য-উৎকর্ষে, ভাষায়, প্রেমে, মানবিকতায় বাঙালি এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দিয়েছিল। তৎসহ এই ভাবাদর্শ অন্যান্য সাহিত্য শাখাকেও প্রভাবিত করেছিল। এই শতকের পদকার হলেন — চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রমুখ।

অনুবাদ সাহিত্যঃ

বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের সূচনা চৈতন্য দেবের আবির্ভাবের পূর্বেই শুরু হলেও তাঁর প্রভাবেই এই সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল। ভাগবতের অনুবাদ একান্তভাবেই কৃষ্ণমুখ্য হয়ে ওঠে। প্রধানত ভাগবতের ১০-১২ স্কন্দের প্রচুর অনুবাদ শুরু হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত — রামায়ণের বিষ্ণু-অবতার রামচন্দ্র একেবারেই ললিত-কোমল বৈষ্ণব ভক্ত হয়ে পড়তে থাকল।

তৃতীয়ত — মহাভারতের অনুবাদ শুরু হয় — যার অন্যতম উদ্দেশ ঐশ্বর্যময় কৃষ্ণের মাহাত্ম্য শ্রবণ।

চতুর্থত — অনুবাদকে কেন্দ্র করে জাতীয় ভাবাদর্শ যেমন গড়ে উঠতে থাকে তেমনি কবিদের প্রতিভাও বিকাশের পথ পায়।

পঞ্চমত — অনূদিত সাহিত্যের মধ্যে চরিত্রগুলি বাঙালি হয়ে ওঠে এবং আখ্যান বা চরিত্রের অনুসৃজন শুরু হয়।

মঙ্গাল কাব্যঃ

বাংলা মঙ্গাল কাব্যের প্রধান প্রধান ধারার বিকাশ এবং কাব্যগুলি এই সময়েই সৃষ্টি হয়েছিল। সমকালে চৈতন্যদেবের মানবপ্রেমের প্রভাবে দেবতারাও কবিদের অনুভবে মানুষের নিকটে চলে আসেন এবং স্নেহশীল-মানবিক-দয়ালু হয়ে ওঠে। দেবতারা ব্রাহ্মণের গণ্ডি পেরিয়ে সমাজের নিচু স্তরের মানুষের হৃদয়ে অধিষ্ঠান পায়।

জীবনী সাহিত্যঃ

মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের ধর্ম-প্রচারক রূপে ও মানবপ্রেমের অবতারত্বে পৌঁছালে তাঁকে নিয়ে 'সন্ত জীবনী' রচনার সূত্রপাত হয়। পরবর্তিতে অন্যান্য বৈষ্ণব ধর্ম-প্রচারকদের নিয়েও জীবনী সাহিত্য রচনা শুরু হয়।

এতদিন স্বর্গের দেবতা বা তারই কোনও এক না-দেখা চরিত্রই বাংলা কাব্যের আধার ছিল। চৈতন্যদেবই প্রথম ব্যক্তি যিনি কাব্যের নায়কের মর্যাদা পেলেন। অর্থাৎ দেববাদের স্থলে মানুষের জয় বা প্রতিষ্ঠা ঘটল। তাঁকে নিয়ে বাংলা ও সংস্কৃতে 'জীবনী কাব্য' লেখা হয়েছে। যেমন — বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত', কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য চরিতামৃত', লোচন দাসের 'চৈতন্য মঙ্গাল', জয়ানন্দের 'চৈতন্য মঙ্গাল', মুরারী গুপ্তের 'শ্রী শ্রী কৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত' (সংস্কৃত) প্রভৃতি।

লোক সংগীতঃ

আপামর বাঙালির প্রাণের ‘লোক সংগীতে’ও চৈতন্যের ভাব-বিহ্বল জীবনের প্রভাব পড়েছে। বাউলের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে — ‘প্রাণের বান্ধবরে দাও দেখা দয়া করে’। এমনকি আধুনিক যুগে পৌঁছেও বাউল গেয়ে উঠেছেন — ‘তোমায় হৃদ মাঝারে রাখব ছেঁড়ে দেব না / ছেঁড়ে দিলে সোনার গৌর আর ত পাব না’।

যোড়শ শতক বাঙালির জীবনের নতুন উদ্যম সাহিত্য-সংস্কৃতিকে শতধারায় গতিপথ খুলে দিয়েছিল। যার সামাজিক সুফল জাতি-ধর্ম-বর্ণের উর্দ্ধে মানবতার প্রতিষ্ঠা এবং সাহিত্যে মধ্যযুগের প্রায় সব ধারাই প্রভাবিত হয়েছিল চৈতন্যদেবের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবে। বর্ণ-বিভাজিত বাঙালিকে অভিন্ন ধর্ম চেতনায় ঐক্যবদ্ধ জাতিতে গড়ে তুলেছিল। এবংবিধ উৎকর্ষকে উত্তরকাল মূল্যায়িত করেছে ‘যোড়শ শতক বাংলা সাহিত্যের ঐশ্বর্যযুগ’।

বাংলা সাময়িক পত্রঃ 'দিগদর্শন' থেকে 'সবুজপত্র' ইতিবৃত্ত ও গুরুত্ব

বাঙালির নবজাগরণের বার্তাবহ বাংলা গদ্য ও বাংলা সাহিত্য সম্পূর্ণভাবে বাংলা সাময়িক পত্র ও সংবাদপত্রকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে। বস্তুত বাংলা গদ্য সাহিত্যের বর্তমান পরিণতির মূলে সমাচার দর্পণ, সংবাদ কৌমুদী, সমাচার চন্দ্রিকা, বঙ্গদূত, সংবাদ প্রভাকর প্রভৃতি দৈনিকের প্রয়াস অনেকখানি। অপরিপুষ্ট এবং অস্ফুষ্ট বাংলা ভাষাকে এরাই দৈনন্দিন জীবনের সর্ববিধ ব্যবহারে সমর্থ করে তুলেছে। প্রসঙ্গত প্রথম বাংলা গদ্যগ্রন্থ কেরী সাহেবের 'কথোপকথন' (১৮০১) প্রকাশের মাত্র সতেরো বছর পর সংবাদপত্র প্রকাশ শুরু হয় ; অপরদিকে ইংরেজি গদ্যের প্রচলনের প্রায় ৮০০ বছর এবং মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কারের প্রায় পাঁচশ বছর পর ইংরেজি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল — অর্থাৎ বাংলা সাময়িক পত্রের সামনে আদর্শ গদ্যের কাঠামো ছিল না। এক্ষেত্রে বাংলা সাময়িক পত্রকে ভাষাপথ স্ববলে খনন করে নিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছে। এই ভূমিকা পালনের প্রসঙ্গেই জিজ্ঞাসা — বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এবং গদ্যের সমৃদ্ধিতে সাময়িক পত্রের গুরুত্ব কতখানি।

বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসের সূচনা হয়েছিল ১৮১৮ সালে — প্রকাশিত হয়েছিল তিনটি পত্রিকা 'দিগদর্শন', 'সমাচার চন্দ্রিকা' এবং 'বাঙ্গালা গেজেটি'। প্রথম বাংলা সাময়িক পত্রের গৌরব 'দিগদর্শন' পেলেও জন চিত্তে প্রবল প্রভাব সৃষ্টি করেছিল 'সমাচার দর্পন' পত্রিকা। 'বাংলা সাময়িক পত্র' গ্রন্থে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮১৮ থেকে ১৮৫৭ সালের মধ্যে প্রকাশিত পত্রিকাগুলিকে চারটি পর্বে বিন্যস্ত করেছেন। যথা —

প্রথম পর্বঃ ১৮১৮- ২২ — এই পর্বের পত্রিকাগুলি মত প্রকাশের স্বাধীনতা পেত।

দ্বিতীয় পর্বঃ ১৮২৩- ৩৫ — সংবাদপত্র আইনের প্রণয়ন করায় কণ্ঠরুদ্ধের কাল।

তৃতীয় পর্বঃ ১৮৩৬- ৩৯ — সাময়িক পত্রের মুক্তির যুগ।

চতুর্থ পর্বঃ ১৮৪০- ৫৭ — এই সময়ের পর মফস্বলের সীমানা ছাড়িয়ে গ্রামাঞ্চল থেকেও পত্রিকার প্রকাশের সূচনা হয়। তাঁর প্রদত্ত তালিকা অনুযায়ী ১৮১৮ থেকে ১৮৭৮ সালের মধ্যে বাংলাদেশে পাঁচশতেরও বেশি মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। এই সাময়িক পত্রিকাগুলি প্রকাশিত হত মূলত বাংলা সাধু ভাষায়। ১৯১৪ সালে প্রম্থনাথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজপত্র'-এ বাংলা চলিত ভাষার প্রয়োগ হয়েছিল। প্রায় একশ বছরের এই পর্বে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে পরিপুষ্ট করে তুলেছিল সাময়িক পত্র। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকার পরিচয় ও ভূমিকা তুলে ধরা হল।

'দিগদর্শন' এবং 'বাঙ্গালা গেজেটি' পত্রিকা দুটির মধ্যে কোনটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল — তা নিয়ে মতান্তর আছে। তবে প্রাপ্ত প্রমাণে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'দিগদর্শন' পত্রিকা ; আর বিজ্ঞাপন অনুসারে প্রথম 'বাঙ্গালা গেজেটি'। শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত 'দিগদর্শন' পত্রিকাটি বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হত। এই পর্বে বাঙালির জনমানসে প্রভূত সাড়া ফেলেছিল 'সমাচার চন্দ্রিকা'। তবে 'দিগদর্শন' এবং 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রিকার ভাষা নিরীক্ষণ করলে— সমাস ও ইংরেজি শব্দের আধিক্য দেখা যায়। রামমোহন 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় (দ্বিতীয় সংখ্যায়) লিখতে গিয়ে বাক্যের ছেদ-যতির কোনও আদর্শ খুঁজে না পেয়ে ইংরেজি রীতি অনুসরণ করে পূর্ণছেদ স্থানে full stop , অর্ধছেদ স্থানে কমা'র ব্যবহার করেছিলেন। তুলনায় 'সম্বাদ কৌমুদী'তে তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় লিখেছিলেন। ভাষার উন্নতিতে 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা স্মরণযোগ্য। তিনি গুরুগম্ভীর লেখার সঙ্গে লঘু বিদ্রুপাত্মক লিখনভঙ্গি, অনুপ্রাস, তৎসম শব্দের সঙ্গে যাবনিক শব্দের ব্যবহার করেছিলেন।

'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা প্রকাশ করে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সংস্কৃতের জটা থেকে বাংলা ভাষা বা গদ্যকে মুক্ত করে লঘু সুরের আমদানি করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কথায় — '... একদিন প্রভাকর বাঙ্গালা সাহিত্যের হর্তাকর্তা বিধাতা ছিলেন, প্রভাকর বাঙ্গালা রচনা রীতিও পরিবর্তন করিয়া যান।' 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার গদ্যে শ্লেষ, যমক, অনুপ্রাস প্রভৃতি অলংকারের সুষ্ঠ প্রয়োগ এবং তৎসম শব্দের সঙ্গে দেশি শব্দ, স্ল্যাং ও প্রবাদ-প্রবচনের মিশ্রণ লক্ষণীয়। প্রম্থনাথ বিশী'র কথায় — 'যে আটপৌরে ভাষা সৃষ্টি কেরীর আকাঙ্ক্ষা ছিল ঈশ্বর

অসিত বিশ্বাস, ডালখোলা, উত্তর দিনাজপুর

গুপ্তের এবং সমসাময়িক সাংবাদিকগণের কলমে হল তার পত্তন।' এই পত্রিকাই বাংলা গদ্যের 'জড়তা মুক্তি' ঘটিয়েছিল।

'সমাচার দর্পন' বাংলা গদ্যকে পাঠ্যপুস্তকের বাইরে দৈনন্দিন মুক্ত অঙ্গানে পৌঁছে দিয়েছিল। রামমোহন রায় বাংলা গদ্যকে দুরুহ শাস্ত্র আলোচনার উপযোগী করে তুলেছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত বাংলা গদ্যকে আটপৌরে জীবনের ভাষা এবং সাহিত্যের ভাষাকে মুখের ভাষার নিকট পৌঁছে দিয়েছিলেন।

উনিশ শতকের চল্লিশের দশকে বাংলা গদ্যের বাক্ বদলে দিয়েছিল **'তত্ত্ববোধিনী'** পত্রিকা। 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা যে সুচনা করেছিল অক্ষয়কুমার দত্ত 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার মধ্য দিয়ে তাকে একটি যুগের প্রতিনিধিত্বে পৌঁছে দিয়েছিলেন — চলেছিল 'বঙ্গাদর্শন' প্যন্ত। সুকুমার সেনের মূল্যায়ণে — 'বাঙ্গালা গদ্যের জটীলতা ঘুচাইয়া বাক্য ভারসাম্যতা ও ব্যবহারযোগ্যতা দিয়াছিলেন অক্ষয়কুমার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাহাতে প্রাণ সঞ্চার করিলেন লালিত্য ও শ্রুতিমার্ধুয্য যোগ করিয়া। বাঙ্গালা গদ্যের নাড়ী দেখিয়া তাহা ধাতুগত স্পন্দন প্রবাহ বা তাল ঠিকমত ধরিয়া সেইভাবে বাক্য গঠন রীতি দেখাইয়া দিলেন বিদ্যাসাগর।'

এই 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার যুগে প্যারিচাঁদ মিত্রের **'মাসিক পত্রিকা'**টিও গুরুত্বপূর্ণ। এই পত্রিকায় সর্বপ্রথম কমা, সেমিকোলন প্রভৃতি বিরাম চিহ্নের যথাযোগ্য ব্যবহার করা হয়েছিল। প্যারিচাঁদ বাংলা গদ্যের মধ্যে যথাসম্ভব কথ্যভাষা প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত যে সূচনা করেছিলেন প্যারীচাঁদের হাতে (আলালের ঘরের দুলাল) সেই প্রচেষ্টা একটি ভিত্তি পায় এবং প্রম্থ চৌধুরীর হাতে বাংলা চলিত গদ্যের 'অভিষেক' ঘটে। তবে বাংলা গদ্যের বিরাম চিহ্নের শিল্পসুষম কাঠামোটি বিদ্যাসাগরের অবদান। এই ধারায় উল্লেখযোগ্য পত্রিকা 'সোমাপ্রকাশ'। এই পত্রিকায় যতই চিহ্নের প্রয়োগ, আধুনিক গদ্য এবং দীর্ঘ বাক্যের বদলে ছোট ছোট বাক্যের প্রচলন করেছিল। তবে পত্রিকাটি দেশি ও তৎসম শব্দের পাশাপাশি প্রয়োগের নিন্দা করেছিল।

'যিনি যথার্থ গ্রন্থাকার, তিনি জানেন যে পরোপকার ভিন্ন গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্য নাই, জনসাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধি বা চিত্তোন্নতি ভিন্ন রচনার জন্য রচনার অন্য উদ্দেশ্য নাই, অতএব যত অধিক ব্যক্তি গ্রন্থের মর্ম গ্রহণ করিতে পারে, ততই অধিক ব্যক্তি উপকৃত ততই গ্রন্থের সফলতা।' — এই আদর্শ বঙ্কিমের এবং **'বঙ্গাদর্শনে'**র। এই পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্র লঘু ও গুরু দুরকমের ভাষাই প্রয়োগ করেছে।

বাংলা গদ্য, সাময়িক পত্রের প্রয়াসে মুখের ভাষার নিকট বা চলিত ভাষাকে বাহন করে সমৃধ্বির সোপান রচনা করেছিল। এই পথযাত্রায় দুটী পত্রিকার ভূমিকা সর্বাধিক — 'ভারতী' এবং **'সবুজপত্র'**। 'ভারতী' থেকে 'সবুজপত্রে' পৌঁছে সাময়িক পত্রের নির্ভরশীলতা ছেঁড়ে বাংলা গদ্য স্বনির্ভর হয়ে সাহিত্যের মূল বাহনের গৌরব অর্জন করে চলিত ভাষা এবং ততদিনে পদ্যের পাশে গদ্য মধ্যম অন্যতম প্রধান বাহনের গৌরব অর্জন করে নিয়েছে।

বাংলা সাময়িকপত্রে প্রথম সাহিত্যধর্মী রচনা 'বাবুর উপাখ্যান' প্রকাশিত হয় 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায়। আবার প্রকাশের পর থেকেই ভাষার বৈচিত্র্য, গদ্য বাক্যের গঠন, ছেদ-যতির শৈল্পিক প্রয়োগ — সবই নির্মিত হয়েছিল সাময়িক পত্রের পরীক্ষাগারে। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় আমরা বলতে পারি — 'এ জগতে কিছুই নিষ্ফল নহে। একখানি সাময়িকপত্রের ক্ষণিক জীবনও নিষ্ফল হইবে না। ...'

নমুনা প্রশ্নঃ 'দিগদর্শন' থেকে 'সবুজপত্র' প্যন্ত বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস বিবৃত করে বাংলা গদ্যের বিকাশে সাময়িক পত্রের গুরুত্ব মূল্যায়ণ কর।

নমুনা প্রশ্নঃ 'সংবাদ প্রভাকর', 'তত্ত্ববোধিনী', 'বঙ্গাদর্শন' ও 'সবুজপত্র'-এর বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় থাকার কারণগুলি বিবৃত করো ।

অসিত বিশ্বাস, ডালখোলা, উত্তর দিনাজপুর

নমুনা প্রশ্নঃ বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশের দুইশ' বছরে বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধিতে সংবাদ-সাময়িকপত্রের ভূমিকা মূল্যায়ন কর।

অসিত বিশ্বাস, ডালখোলা, উত্তর দিনাজপুর

নাট্যকার অমৃতলাল বসু

বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে গিরিশচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে উচ্চারিত হয় নাট্যকার অমৃতলাল বসু'র নাম। বাংলা 'প্রহসন' ধারার নাটকের ঐশ্বর্য্য পর্বের অন্যতম প্রধান নাট্যকার ছিলেন অমৃতলাল বসু। বলাবাহুল্য যে মধুসূদন, দীনবন্ধু'র পর বাংলা 'প্রহসন' নাটকের ধারাকে পুনরুজ্জীবিত করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর — অমৃতলাল বসু, তাঁর ভাবশিষ্য ছিলেন। অমৃতলালের রচনায় ঈশ্বর গুপ্ত থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, শেক্সপিয়ার, ড্রাইডেন, মলিয়র প্রমুখের প্রভাবের স্বীকরণ ঘটেছে। হাস্যরস সৃষ্টির গুণে বাঙালি দর্শক তাকে 'রসরাজ' উপাধিতে ভূষিত করেছিল। অমৃতলাল 'প্রহসন' ধারার সঙ্গে অন্যান্য ধারার নাটকও লিখেছিলেন। নিম্নে তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটকগুলির পরিচয় দেওয়া হল।

'চোরের উপর বাটপারি' (১৮৮৬) - অমৃতলাল বসু'র প্রথম 'প্রহসন' নাটক। এক দুশ্চরিত্র বিষয়ী ব্যক্তি এক বেকার যুবকের দ্বারা কোনও ভদ্র স্ত্রীলোককে ফুসলাতে গিয়ে কীভাবে জব্দ হল এবং তার নিযুক্ত ব্যক্তি তারই স্ত্রীকে ফুসলাতে বসল — এই নিয়ে আলোচ্য নাটকটি লেখা। 'চাটুজ্যে বাড়ুজ্যে' (১৮৮৬)'প্রহসন'টি জে.এম.মর্টনের 'Cox and Box' 'প্রহসনে'র সাদৃশ্যে রচিত। ক্ষুদিরাম বাড়ুজ্যে ও পুঁটিরাম বাড়ুজ্যে এই দুই বন্ধুর মধ্যে হালকা রসিকতা নিয়ে 'প্রহসন'টি রচিত হয়েছে। 'তাজ্জব ব্যাপার' (১৮৯০) উদ্দেশমূলক এই 'প্রহসন'টি স্ত্রী স্বাধীনতার নামে যথেচ্ছাচারের মূলে পুরুষদের মতিভ্রম নিয়ে লেখা হয়েছে। নাটকটির প্রস্তাবনায় বঙ্গ নারীদের গানে আছে —

'ফাটকে আটক রব না
আপন করে যতন করে খুলে দেই ডানা'

অমৃতলাল বসু'র কয়েকটি 'প্রহসনে'র মধ্যে নীতিশিক্ষার উদ্দেশ খুঁজে পাওয়া যায় — যথা 'বিবাহ বিভ্রাট', 'সম্মতি সংকট', 'কালাপানি বা হিন্দুমতে সমুদ্র যাত্রা', 'একাকার', 'গ্রাম্য বিভ্রাট', 'বাঞ্ছারাম' প্রভৃতি। 'বিবাহ বিভ্রাট' (১৮৮৪) নাটকে বিজাতীয় ভাবাপন্ন নব্য সমাজ এবং পুত্রের বিবাহের পণ আদায় করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত প্রতারিত হয়েছে। পরিশেষে অর্থ পিশাচ গোপীনাথ উপলব্ধি করেছে — '... পাঁঠা ব্যাচার টাকা থাকে না — পাঁঠির পোষাণির টাকাও থাকে না'। 'সম্মতি সংকট' (১৮৯৮) বাল্যবিবাহ নিরোধ করার জন্য যে আন্দোলন হয়েছিল তার নিন্দা করে লেখা নাটক।

'কালাপানি বা হিন্দুমতে সমুদ্র যাত্রা' নাটকটিতে দুলাল চাঁদ বিদেশে যাওয়ার গৌরবকে কাজে লাগিয়ে বিখ্যাত হতে চায় — তার প্রজা তর্ক চূড়ামণি বিরোধিতা করে। এই বিরোধিতা নিয়ে বিতর্ক সারা দেশে ছড়িয়ে পড়লে আসল কার্য্য সিদ্ধ হয়েছে বিবেচনায় দুলাল চাঁদ আর বিদেশে গেল না। 'গ্রাম্য বিভ্রাট' নাটকের বিষয় পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে গ্রাম্যাঞ্চলে দলাদলি হওয়ার ফলে যেভাবে শান্তি বিনষ্ট হয়েছে তারই এক কৌতুক চিত্র।

'প্রহসন' রচনায় অমৃতলালের খ্যাতি বা অখ্যাতির মূলে তার বিদ্রুপাত্মক 'প্রহসন'গুলি। এই শ্রেণির উল্লেখযোগ্য 'প্রহসন'গুলি হল — 'তিল তর্পণ', 'রাজা বাহাদুর', 'বাবু', বৌমা', 'সাবাস আঠাশ', 'বাহবা বাতিক', 'সাবাস বাঙালি', 'খাস দখল', 'ব্যাপিকা বিদায়', 'দ্বন্দ্বে মাতরম' ইত্যাদি।

'তিলতর্পণে' বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গের খোঁচায় থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত সকলেই জর্জরিত হয়েছে। 'রাজা বাহাদুর' প্রহসনে এক মূর্খ, ল্মপ্ট বাঙাল জমিদার 'রাজা' খেতাব পেতে চেয়ে এক ধূর্তের খপ্পরে পড়ে। ধূর্ত, জমিদারের কাছ থেকে প্রচুর অর্থ আত্মসাৎ করে। এক দরিদ্র মদ্যপ সাহেবকে দিয়ে জমিদারকে রাজা খেতাব দেওয়ার আয়োজন করতে গিয়ে ধরা পড়ে এবং জমিদারের স্ত্রীর হাতে লাঞ্ছিত হয়।

'বাবু' (১৮৯৪) প্রহসনে বিজাতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্পর্শে নব্য-শিক্ষিত উৎকেন্দ্রিক যুব সমাজের আচারভ্রষ্টতা ও উৎশৃঙ্খলতার এক জীবন্ত চিত্ররূপ অঙ্কিত হয়েছে। এই সামাজিক নকশায় বিচ্ছিন্নভাবে সমাকালীন চর্চিত বিষয় — বিধবা বিবাহ, ভারত উদ্ধার, সংবাদপত্র করা, দুর্ভিক্ষে সাহায্য, ব্রাহ্ম সমাজের আচরণ ধর্ম, মদ্যপান প্রভৃতি উপস্থাপিত হয়েছে।

'বৌ-মা' (১৮৯৭) প্রহসনটিতে দুটি অঙ্কের দশটি দৃশ্যে প্রগতিশীল নব্যযুবক বাবুরামের ভ্রষ্টাচার এবং পরিণামে শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে সই শ্রেণির মানুষদের আচার-আচরণের হাস্যকরতা দেখিয়ে, তাদের সংশোধন করতে চেয়েছেন নাট্যকার।

'খাসদখল' (১৯১২) — নাট্যকার অমৃতলালের অসাধারণ প্রাহসনিক প্রতিভার স্বাক্ষর মুদ্রিত হয়েছে আলোচ্য নাটিকায়। নাটকে লোকেন ও মোক্ষদার কাহিনি অবলম্বন করে লেখক বিধবা বিবাহ এবং চিকিৎসকের সম্বন্ধে বিদ্রূপ করেছে। কিন্তু মোক্ষদার কাহিনির পাশে কুসুমকোমলা গিরিবালার রহস্যময় আখ্যান মৃদু সৌরভের মতো অগোচরে প্রাণে আনন্দের সঞ্চার করে।

অসিত বিশ্বাস, ডালখোলা, উত্তর দিনাজপুর

‘ব্যাপিকা বিদায়’ (১৯২৬) — ব্যাপকের স্ত্রী লিঙ্গে ব্যাপিকা। যে আচ্ছাদন করে নিজেকে বিস্তার করে, নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে সেই ব্যাপিকা। এই নাটকে ব্যাপিকা হলেন মিসেস পাকড়াশী — যে নিজের মেয়ে মিনির সংসারে ঢুকে তার চরম অনিষ্টকর স্বভাব ও দুর্ব্যবহারের দ্বারা মেয়ে ও জামাইয়ের সংসারে চরম জটিলতা সৃষ্টি করেছে। ব্যাপিকার শেষ পর্যন্ত বিদায় ঘটেছে। তাই নাটকের শিরোনামে দেখানো হয়েছে ‘ব্যাপিকা বিদায়’।

‘প্রহসন’ রচনায় অমৃতলাল বসু কয়েকটি মূল ধারার নাটকও লিখেছিলেন। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ‘তরুবালা’ (সামাজিক নাটক), ‘নব যৌবন’ (কমেডি), ‘যাজ্ঞসেনী’ (পৌরাণিক নাটক), এবং গিরিশচন্দ্রের আদর্শে লিখেছিলেন ‘আদর্শ বন্ধু’।

‘নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন’ (১৮৭৬) প্রণয়ন হলে বাংলা নাটক ও নাট্যকারেরা সংকটের সম্মুখীন হয়। এই সংকটের সমাধানে সকলেই ভিন্ন ভিন্ন উপায় অনুসরণ করতে শুরু করে। এই স্ম্য বিশেষ প্রাধান্য পায় ‘পৌরাণিক নাটক’ এবং ‘ঐতিহাসিক নাটক’। রবীন্দ্রনাথের ‘রূপক-সাংকেতিক’ নাটকের যুগ তারপর শুরু হয়। এই ‘নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন’ থেকে পরবর্তী প্রায় পঞ্চাশ বছর বাংলা রঙ্গামঞ্চকে এবং বাঙালি দর্শককে মূলত ‘প্রহসনে’র মধ্য দিয়ে নাট্যরস যোগান দিয়েছেন অমৃতলাল বসু। বাঙালি দর্শকেরাও তাকে প্রতি-উপহারে সম্মানিত করেছেন ‘রসরাজ’ অভিধায়।

অসিত বিশ্বাস, ডালখোলা, উত্তর দিনাজপুর

নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

বাঙালি যখন আধুনিক চেতনার দিকে অগ্রসরমান, তখন মজ্জাগত ধর্ম বিশ্বাসকে আধুনিক সাহিত্যের নাট্য শৈলীতে উপস্থাপন করে অভিনন্দিত হয়েছেন নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। একদিকে গিরিশচন্দ্রের নাটক দেখে ধর্শক-মন প্রস্তুত এবং অপরদিকে রবীন্দ্র নাট্যশৈলী গ্রহণে দর্শকের অক্ষমতা — এই দুইয়ের মাঝে নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ সমাদৃত হয়েছিলেন। তৎসহ 'বঙ্গভঙ্গ' ও দেশাত্মবোধের প্রেরণায় উদ্দীপিত করে বাঙালির মনে শ্রদ্ধা এবং শাসকের সমীহ অর্জন করেছিলেন তিনি। তাঁর নাটকগুলিকে তিনটি প্রধান শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা যায় — রোম্যান্টিক, পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক ; তৎসহ তিনি কয়েকটি গীতিনাট্যও লিখেছিলেন। প্রসঙ্গত নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ নাটকের প্রতি ভালোবাসায় অধ্যাপনা ত্যাগ করে এক সময় নাটক রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন।

∇ রোম্যান্টিক নাটকঃ

নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রথম নাটক 'ফুলশয্যা'। পৃথ্বীরাজ ও সঙ্গারাজের ভ্রাতৃবিরোধ এবং পরিণামে তাদের মিলন অবলম্বনে নাটকটি রচিত। 'বিধাতার বিধানে যেদিন কঠোরতা ঘুচিয়া প্রাণে রস প্রবিষ্ট হইল, সেইদিন থেকেই নারীর সৃষ্টি ও সংসার আনন্দময় হইয়াছে' — এই বার্তা প্রতিপন্ন করে লিখেছিলেন 'প্রেমাঞ্জলি'। পর্বতমুনি এবং নারদমুনির মর্ত্য নারীর পদতলে 'প্রেমাঞ্জলি'দানের কাহিনি এর উপজীব্য।

ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রসিদ্ধি 'আলিবাবা' (১৮৯৭) রঙ্গনাট্য রচনায়। নাটকটির আখ্যানসূত্র আরব্য গল্পগাথা হলেও হাস্যচটুল নৃত্যগীতের গুণে প্রশঙসিত হয়েছিল। নাটকে কাশেম ও আলি দুই ভাই। কাশেম ধনীর কন্যা সাকিনাকে বিয়ে করে প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারী ও গণ্যমান্য ওমরাহ ; অপরদিকে আলি দরিদ্র কাঠুরিয়া। আলি কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে ডাকাতদের গচ্ছিত ধনভাণ্ডারের সন্ধান পায় এবং প্রভূত বিত্তশালী হয়ে ওঠে। কাশেমও ডাকাতদের ধনের প্রতি লোভী হয়ে পরিণতিতে পরাণ দেয়। এই ঘটনাবৃত্তে মর্জিনা বার বার কাসেমের ত্রাতা হয়ে পুত্রবধূর আসন অর্জন করে।

হিন্দু সমাজের কুসংস্কার, জাত্যাভিমান, প্রায়শ্চিত্তবিধান তৎদ্বারা সামাজিক অনিষ্ট সাধন ইত্যাদি নিয়ে লিখেছিলেন 'কুমারী' নাটকটি। 'বিদৌরা' (১৯০৩) নাটকটির বিষয় আরব্য উপকাহিনি। একটি অলৌকিক স্বপ্নবৃত্তান্ত নিয়ে লিখেছিলেন 'সপ্তম প্রতিমা' (পরিবর্তিত রূপ 'দৌলতে দুনিয়া') (১৩০৯) নাটকটি। 'বাসন্তি' (১৯০৮) নাটকটি বাস্তব জগতের মানব চরিত্র ও কল্প জগতের অপস্রা চরিত্র অবলম্বনে রচিত। এছাড়া নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ লিখেছিলেন 'পলিন' (১৩১৭), 'বাদশাহজাদী' (১৩২২), 'রক্ষঃরমণী', 'নিয়তি', 'কিন্নরী' (১৯১৮), 'বিদূরথ', 'মিডিয়া' ইত্যাদি নাটক।

∇ পৌরাণিক নাটকঃ

মধ্যযুগীয় বিশ্বাস এবং গিরিশচন্দ্রকে অনুসরণ করে ক্ষীরোদপ্রসাদ কয়েকটি পৌরাণিক নাটক লিখেছিলেন। এই ধারার উল্লেখযোগ্য নাটক — 'বভ্রুবাহন', 'সাবিত্রী', 'উলূপী', 'ভীষ্ম', 'মন্দাকিনী', 'নরনারায়ণ'।

মহাভারতের সুপরিচিত অর্জুন-চিত্রাঙ্গদা ও বভ্রুবাহনের কাহিনি নিয়ে তাঁর প্রথম পৌরাণিক নাটক 'বভ্রুবাহন' (১৩০৬)। 'সাবিত্রী' (১৯০২) নাটকের বিষয় সাবিত্রী এবং সত্যবানের পৌরাণিক আখ্যান। ধর্মমঙ্গালের সূত্র নিয়ে ক্ষীরোদপ্রসাদ লিখেছেন 'রঞ্জাবতী' নাটকটি। 'উলূপী' (১৩১৩) নাটকটি মহাভারতের 'অশ্বমেধ' পর্বের এক সুপরিচিত কাহিনি নিয়ে লেখা। পৌরাণিক নাটকের মধ্যে তাঁর 'ভীষ্ম' (১৯১৩) বিশেষ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। এই নাটকে অষ্ট বসু'র জন্ম বৃত্তান্ত থেকে আরম্ভ করে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শরশয্যায় ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যুর কাহিনি পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে।

ক্ষীরোদপ্রসাদের সর্বাধিক জনপ্রিয় নাটক 'নরনারায়ণ' (পূর্বনাম 'কর্ণ') (১৯২৬)। নাট্য আখ্যানে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সূচনা থেকে কর্ণের পতন পর্যন্ত মহাভারত কাহিনির কোনও কোনও অংশ গৃহীত হয়েছে। নাটকের প্রস্তাবনায় তিনি বলেছেন —

অসিত বিশ্বাস, ডালখোলা, উত্তর দিনাজপুর

'দৈব কিংবা পুরুষকার
নিদান বিধান কোন্ রাজার,
কর্ম সাক্ষী বিজয়-লক্ষ্মী
কোন্ মহানে করে বরণ ?'

নাটকটির আরম্ভ হয়েছে কর্ণের ব্রহ্মশাপ প্রাপ্তি থেকে এবং শেষ হয়েছে কর্ণের প্রাণ উৎসর্গে।

∇ ঐতিহাসিক নাটকঃ

বিশ শতকের প্রথম দশকে যে জাতীয় মন্ত্রপূত অনুপ্রারনাময় নাটকাবলীর প্রণয়ন হয়েছিল তার সূচনা ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য' নাটকে। তাঁর এই ধারার অন্যান্য নাটকগুলি হল — 'রঘুবীর', 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত', 'পদ্মিনী', 'অশোক', 'চাঁদবিবি', 'বাঙলার মসনদ', 'আলমগির ও বিদূরথ'।

'প্রতাপাদিত্য' (১৯০৩) নাটকটি যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য এবং তার পিতৃব্য বসন্ত রায়ের সঙ্গে বিবাদের ঘটনা নিয়ে লেখা। ইতিহাসের ক্ষীণ আখ্যানের সূত্র নিয়ে রচিত হলেও ক্ষীরোদপ্রসাদের 'রঘুবীর' (১৯০৩) নাটকটি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। সুপরিচিত পদ্মিনী উপাখ্যানকে নিয়ে 'পদ্মিনী' (১৯০৬) নাটকটি লেখা। পলাশীর যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য নিয়ে তিনি লিখেছিলেন 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত'।

দ্বিজেন্দ্রলালের 'তারাবাঈ' ও ফরাসি ইতিহাসের জোয়ান অব আর্কের চরিত্র অবলম্বন করে ক্ষীরোদপ্রসাদ লিখেছিলেন পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের নাটক 'চাঁদবিবি' (১৯০৭)। 'আলমগীর' (১৯২১) নাটকটি ক্ষীরোদপ্রসাদের কৃতিত্বের 'বিজয় বৈজয়ন্তী'। নাটকে আলমগীর উদিপুরি এবং রাজসিংহ, ভীম সিংহ, জয় সেনের কাহিনি সমগুরুত্ব পেয়েছে।

ক্ষীরোদপ্রসাদের অন্যতম প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নাটক 'বাংলার মসনদ' (১৩১৭)। নাটকটি আলিবর্দির বাংলা অধিকারের কাহিনি নিয়ে লেখা। মধ্যযুগের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় এক ঐতিহাসিক বিবরণ নিয়ে লিখেছিলেন 'খাঁজাহান'।

গিরিশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা পর্ব যখন উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে এবং রবীন্দ্রনাথের নাটককে গ্রহণে বাঙালি যখন প্রস্তুতির পথে এই অন্তর্বর্তী পর্বে বাংলার রঙ্গামঞ্চকে রসদ জুগিয়ে বাঙালির হৃদয়ে সমাদৃত হয়েছিলেন নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

অসিত বিশ্বাস, ডালখোলা, উত্তর দিনাজপুর

বাংলা প্রবন্ধের ধারা — অক্ষয় কুমার দত্ত

উনিশ শতকের বাংলাদেশে আগ্রহ, অনুসন্ধিৎসা ও অন্বেষণের মধ্য দিয়ে নবজাগরণের শুরু হয়েছিল — অক্ষয় কুমার দত্ত /১৮২০-৮৬/ তাঁর অগ্রপথিক। তিনি একদিকে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানচর্চা, যুক্তিবাদ, প্রযুক্তির বিকাশকে স্বাগত জানিয়েছেন, অন্যদিকে দেশীয় ধর্মের প্রতি মমত্ব, খ্রিস্টধর্মের আগ্রাসনের বিরোধিতা এবং বাল্য বিবাহের বিরোধিতা, নারী শিক্ষার পক্ষে সমর্থন ও প্রচার, বিধবা বিবাহের সমর্থন, বহু বিবাহের বিরোধিতা করেছেন। বিদ্যাসাগরের পূর্বে 'পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত বাঙ্গালা গদ্যের তিনিই ছিলেন প্রথম সুলেখক' /বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য/ সুকুমার সেন। পত্রিকা সম্পাদনায় তিনি ছিলেন প্রবাদপ্রতিম, জ্ঞানবিজ্ঞান নির্ভর পাঠ্য বই লিখেছেন, অনুবাদ করেছেন, সন্দর্ভ লিখেছেন, তিনি বাগ্মী এবং সুশিক্ষক।

ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিত্ব

অক্ষয় কুমার দত্তের জন্ম হয়েছিল ১৮২০ সালের ১৫ জুলাই, বর্ধমান জেলার চুপি গ্রামে। মাত্র নয় বছর বয়সে শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশে কলকাতায় আসেন, ভরতি হন ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে। এখানেই হার্ডম্যান জেফ্রয়-এর নিকট গ্রিক, ল্যাটিন, হিব্রু, জার্মান ভাষা আয়ত্ত করেন। ভাষা শিক্ষার সঙ্গে হোমারের ইলিয়ড, ভার্জিলের ঈনিড, পদার্থ বিজ্ঞান, ভূগোল, জ্যামিতি, বীজগণিত, ত্রিকোনামিতি, উচ্চ গণিত, বিজ্ঞানের নানা বিষয়, ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন। শিশু অক্ষয় গ্রামের পাঠশালায় পড়ার সময় তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছিল — ভূমণ্ডলের কালি বা ক্ষেত্রফল কত ? অনুমান করা যায় এই শিশুর আগ্রহের জগত শাস্ত্র বা পৌত্তলিকতায় আবদ্ধ থাকবে না। সারা জীবন তিনি বিজ্ঞান সাধনা করে গেছেন এবং ছাত্রদের বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্য উপযুক্ত গ্রন্থ, বিদেশি শব্দের পরিভাষা নির্মাণ, কথাকে বিশ্বাস দিয়ে নয় যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

অক্ষয় কুমার দত্ত ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তের সংস্পর্শে লিখেছেন অনঙ্গমোহন কাব্য এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম সমাজে দীক্ষা নিয়েছেন, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন এবং শিক্ষকতা করেছেন। আবার বিদ্যাসাগরের সমাজ আন্দোলনের সমর্থনও করেছেন।

প্রাবন্ধিক অক্ষয় কুমার দত্তের সমাজ আন্দোলন

অক্ষয় কুমার দত্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম সম্পাদক এবং ইতপূর্বে প্রকাশিত স্বল্পায়ু বিদ্যাদর্শন পত্রিকাও সম্পাদনা করেছেন। এই বিদ্যাদর্শন পত্রিকার উদ্দেশ বলতে গিয়ে প্রথম সংখ্যায় লিখেছিলেন —

> 'যত্নপূর্ব্বক নীতি ও ইতিহাস, এবং বিজ্ঞান প্রভৃতি বহু বিদ্যার বৃদ্ধি নিমিত্ত নানা প্রকার গ্রন্থের অনুবাদ করা যাইবে, এবং দেশীয় কুরীতির প্রতি বহুবিধ যুক্তি ও প্রমাণ দর্শাইয়া তাহার নিবৃত্তির চেষ্টা হইবে।'

এই পত্রিকাটি স্ত্রী শিক্ষার পাশাপাশি বহুবিবাহের কুফল নিয়ে সমাজকে সচেতন করেছে। তৎকালীন সমাজের বিশ্বাস ছিল শিক্ষিত মেয়েরা বিধবা ও অসতী হয় — এই পত্রিকা যুক্তি দিয়ে সেই ধারণাকে খণ্ডন করেছিল। সপক্ষের যুক্তি প্রতিষ্ঠা করতে প্রাচীন কালে মেয়েদের শিক্ষার দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছিল এবং দেশ-হিতৈষীদের কর্তব্য বিষয়েও সচেতন করেছিল। পরবর্তীতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেও স্ত্রী শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় লিখেছেন —

> 'যতকাল এই ভারতবর্ষীয় অবলারা বিদ্যার আলোকপ্রাপ্ত না হইবে এবং তদ্দ্বারা সত্যাসত্যের জ্ঞান লাভ করিয়া যথার্থ ধর্ম্ম অধিকারিণী না হইবে, ততকাল সম্যকরূপে এদেশের মঙ্গাল হইবার সম্ভাবনা নাই।'

অক্ষয় কুমার দত্ত, রামমোহন রায় এবং ডিরজিওর দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিলেন। ১৮৪২ সালে বিদ্যাদর্শন পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় তিনি কৌলিন্য প্রথা ও বাল্যবিবাহের বিরোধিতা করে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। পরবর্তিতে বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে কৌলিন্যপ্রথা, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের সমালোচনা করেছেন।

এই সমাজ আন্দোলনের পাশাপাশি যুব সমাজের মধ্যে মদ খাওয়ার কুফল নিয়ে আলোচনা ও অধপতনের তীব্র সমালোচনা করেছেন তিনি। বাঙালিদের মধ্যে মদ খাওয়ার বিরোধিতা করে ধারাবাহিক সমালোচনার মধ্যে দিয়ে সমাজকে তিনিই প্রথম সচেতন করে তোলেন।

উনিশ শতকের সমাজে সব বাঙালি চিন্তাশীল ব্যক্তিত্বই কৃষকদের উপর জমিদারের, নীলকরদের শোষণের সমালোচনা করেছেন — অক্ষয় কুমার দত্ত তাদের অন্যতম।

প্রবন্ধ সাহিত্যে অক্ষয় কুমার দত্ত

তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হয়ে তিনি ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থের অভাববধ করেন। প্রসঙ্গাত ভারতীয় শিক্ষায় আধুনিক প্রসার ঘটানোর নির্দেশ এসেছিল স্বয়ং ইংলন্ড থেকে। ১৭৬৩ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে ইংরেজ সরকার এই নির্দেশ দিয়েছিল। শিক্ষক অক্ষয় কুমার দত্ত পড়াতে গিয়ে বিশেষত ভূগোল ও পদার্থবিদ্যার পাঠ্য গ্রন্থের অভাব অনুভব করেছিলেন। সেই দায়িত্ব নিজেই নিয়েছিলেন এবং লেখেন প্রথম ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ ভূগোল ১৮৪১। এই গ্রন্থটি আকারে ছোট। ছোট ছোট কয়েকটি অধ্যায়ে পৃথিবীর আকার, জলভাগ, স্থলভাগ, এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও পলিনাশিয়ার কথা আলোচিত হয়েছিল। তৎসহ ছিল ভারতের বিভিন্ন রাজ্য, পাহাড়-পর্বত, নদনদী, ফলমূল, কৃষি-বাণিজ্য ও প্রধান প্রধান ভাষা নিয়ে কিছু কথা।

বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার — এই গ্রন্থটি ১৭৭০ শকের মাঘ সংখ্যা থেকেই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হতে শুরু করে। এই পত্রিকার লেখাগুলিকে নিয়ে দুই খণ্ডে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থের প্রেরণা ছিল জর্জ কুম্বের লেখা The Constitution of Man এবং Essays on Phrenology গ্রন্থ দুটি। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে শরীরবৃত্তির মিতাচার ও জীবনযাত্রার প্রকৃষ্ট পদ্ধতি বিচার এবং নিরামিষ ভোজনের যৌক্তিকতা আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে ধর্ম ও সমাজের নিয়ম প্রতিপালন করা এবং মদ খাওয়ার দোষ নিয়ে সমালোচনা করেছেন। এই দ্বিতীয় খণ্ডেই সমালোচনা করেছেন বাল্যবিবাহ ও বহু বিবাহের বিপক্ষে এবং বিধবা বিবাহ ও স্ত্রী শিক্ষার পক্ষে।

চারুপাঠ — এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে ২৩টি, দ্বিতীয় ভাগে ৩৪টি ও তৃতীয় ভাগে ১৫টি অধ্যায় আলোচিত হয়েছে। এই গ্রন্থের বেশিরভাগ লেখাই তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থের ৪০টির বেশি প্রবন্ধে বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে লিখেছেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে শিক্ষিত বাঙালি সমাজ যে নবজাগরণের পথ সন্ধান করছিল 'চারুপাঠ' তাদের কাছে আলোর দিশা স্বরূপ। গ্রন্থটি শহর থেকে গ্রাম সর্বত্র প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। গ্রন্থটি ভিন্ন ভাষার মানুষদের কাছেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল — যার দৃষ্টান্ত হিন্দি, ওড়িয়া ভাষায় অনুবাদ।

ধর্মনীতি — বিভিন্ন ইংরেজি গ্রন্থ অনুসরণ করে লেখা। ১১টি অধ্যায়ে লেখা এই গ্রন্থে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার কথা আলোচিত হয়েছে। এই গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে বাল্য বিবাহের কুফল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন। তাঁর আলোচনার উদ্দেশ ছিল সমাজে মেয়েদের সম্মানজনক স্থান লাভ।

ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় — অক্ষয় কুমার দত্তের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এই গ্রন্থটি হোরেস হেম্যান উইলসনের লেখা 'The Religious Sects of the Hindoos' অবলম্বনে লেখা। তবে হোরেসের গ্রন্থে ৪৫টি উপাসক সম্প্রদায়ের কথা বলা হয়েছে, পক্ষান্তরে অক্ষয় কুমার দত্ত ১৮২টি ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায়ের কথা আলোচনা করেছেন। তৎসহ হোরেসের গ্রন্থে যেসব ভুল তথ্য ছিল সেগুলিও সংশোধন করেছেন তিনি।

পদার্থবিদ্যা — এই গ্রন্থে আকর্ষণ, মধ্যাকর্ষণ, চৌম্বক আকর্ষণ, তড়িৎ আকর্ষণ, পদার্থবিদ্যা, ঘনত্ব, গতির নিয়ম, ভারকেন্দ্র ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন। ছাত্রদের উপযোগী ভাষা নির্বাচন তাঁর দক্ষতার পরিচয়। যেমন —

ক) 'পদার্থে'র পরিচয় দিয়ে বলেছেন —

'যে বিদ্যা শিক্ষা করিলে নির্জীব জড় পদার্থের গুণ ও গতির বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহার নাম পদার্থবিদ্যা।'

খ) 'শক্তি'র সংজ্ঞা দিয়ে বলেছেন —

'যদ্দ্বারা কোন বস্তু চালিত হয় তাহাকে শক্তি বলে। অশ্বের শক্তিদ্বারা রথ চালিত হয়, বাষ্পের শক্তি দ্বারা বাষ্পযন্ত্রের চক্রসকল ঘূর্ণিত হয়, এবং পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণশক্তি দ্বারা বৃক্ষের ফল ও মেঘের জল ভূতলে পতিত হয়।'

অক্ষয় কুমার দত্তের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় — 'প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা' এবং 'ভারতবর্ষের সহিত অন্যান্য দেশের পূর্ব্বকালীন বাণিজ্য বিবরণ' গ্রন্থ দুটি।

বৈজ্ঞানিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে লিখতে গিয়ে অক্ষয় কুমার দত্ত ভাষা ও পরিভাষার অভাব অনুভব করেছেন। নিজেই উদ্যোগ নিয়ে বিদেশি শব্দের পরিভাষা নির্মাণ করেছেন। যেমন — self-esteem > আত্মাদার, Vaccination > গোমসূর্্যাবিধান, adhesiveness > জুগোপিষা, individuality > ব্যক্তিগ্রাহিতা, physiology > শরীরিবিধান, anatomy > শরীর স্থান, machine > শিল্পযন্ত্র, revolution > রাজবিপ্লব, love of life > জিজীবিষা ইত্যাদি।

অক্ষয় কুমার দত্তের বসবার ঘরে শোভা পেত রাজা রামমোহন রায়, নিউটন, ডারউইন, হাক্সলি, জন স্টুয়াট মিল — এই পাঁচ জন। এথেকেই বোঝা যায় মানুষটির চিন্তার জগত কেমন ছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও শিল্পবিকাশকে স্বাগত জানানোয় তিনি অগ্রপথিক। তিনি সমাজ সংস্কার কর্মে ছিল একজন বিপ্লবী — যার মূল্য বুঝতে প্রায় অর্ধশতক ব্যয় করতে হয়েছে। প্রবাদপ্রতিম সম্পাদক, বাগ্মী, পাঠ্যপুস্তক প্রণেতা, কৃষক সমস্যার অগ্রণী চিন্তাবিদ, সমাজে নারীদের অধিকার ও সম্মান প্রতিষ্ঠায় তিনি স্মগ্র বাংলাদেশের নমস্য। তাঁর মূল্যায়ন করে বিদ্যাসাগরের জীবনীকার বিহারীলাল সরকার লিখেছেন —

'অনুবাদ ও লিপিচাতুর্্যে অক্ষয়কুমার দত্তেরও কৃতিত্ব কম নহে। ভাষার পরিশুদ্ধি ও সুপদ্ধতি সম্বন্ধে অক্ষয় কুমার বিদ্যাসাগরের সমকক্ষ।'